প্রকাশক—শ্রীগিরীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ
কাত্যায়নী বুক স্টল
২০৩ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

দেড় টাকা

প্রিণ্টার :—শ্রী[illegible]নানন্দ সিংহ রায়
শ্রীকালী প্রেস
৬৫, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নিবেদন

স্ত্রীশিক্ষামূলক গ্রন্থের বঙ্গদেশে অভাব নাই। কিন্তু যে-সমস্যাগুলি বর্ত্তমানে আমাদের স্ত্রী-সমাজকে অত্যন্তই চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, যাহাদের ভাল-মন্দ সমাধানের সঙ্গে সমাজের এক-অর্দ্ধাংশের সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং হয়ত-বা যাহাদের সুমীমাংসার প্রতীক্ষায় আমাদের নারীসমাজের অগ্রগতি বর্ত্তমানে আরও বহুদিগেই বাঁধাপ্রাপ্ত ও রুদ্ধ হইয়া আছে—তদ্‌বিষয়ক পুস্তকের আজকাল খুব প্রাচুর্য্য দেখা যায় না। এই অভাবটী যদি কতকাংশেও পরিপূরণ করা সম্ভব হয়, সেই উদ্দেশ্যেই এইগ্রন্থ লিখিলাম—কৃতকার্য্য কতটা হইয়াছি বলিতে পারি না। "নারীর কর্ম্মযোগ" লিখিতে বসিয়া কর্ম্মযোগের সেই সুমহৎ বাক্যটী আজ কিছুতে বিস্মৃত হইতে পারি নাই—"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"। সে যাহাই হউক—মনে হয়, এই যুগসন্ধিক্ষণে এতদ্দেশের ঘরে ঘরে এজাতীয় গ্রন্থের সত্যই আজ ডাক্ আসিয়াছে, এই ভাঙ্গন-গড়নের দিনে সকলদিকেই আজ যুক্তিতর্কের প্রবল আবশ্যকতা। নিছক্ উপদেশের বোঝা লইয়া মানুষ আর নিশ্চিন্ত বা সন্তুষ্ট রহিবে—সে আশা অমূলক। কিন্তু যুক্তিতর্ক সকল সময়েই কিছুটা জটিল এবং অনেকটা নিরসও বটে। এই জটিল ও নিরস ভাবটাকে যতটা সাধ্য অবশ্যই আমরা এগ্রন্থে দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আর, সঙ্গে সঙ্গে পাঠকপাঠিকা-দিগের ইহাও আমরা গোচর করিতেছি যে—নারিকেলের শাস্ বাহির করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ছোব্‌রা-ছাড়ানোটীও অবশ্যই অনিবার্য্য। সম্প্রতি, এইজাতীয় সমস্যামূলক গ্রন্থগুলির পক্ষেই ওকালতি করিয়া বিলাতের কোনও একটী বিখ্যাত কাগজে এই একটা মন্তব্য বাহির হইয়াছে যে—যাঁরা কেবল হাল্‌কা-সাহিত্যেরই পাঠক, গুরুবিষয়ক কোনও গ্রন্থ পাঠ করেন

না—জীবনের একটা বড় আনন্দ হইতেই তাঁহারা বঞ্চিত হন। *
কথাটা একেবারে অমূলক নয় হয়ত?

যাহাহউক, এগ্রন্থ সম্বন্ধে সাধারণের নিকট আমাদের আর একটা শেষ নিবেদন আছে।—

ঈশ্বরে যাঁহাদের বিশ্বাস নাই, এজগৎটা সম্পূর্ণভাবে তাঁহারই ইচ্ছায় চলিতেছে, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথেই অবিরত নিয়ন্ত্রিত হইতেছে—একথায় যাঁহাদের প্রত্যয় নাই, তাঁহারা এগ্রন্থ পড়িবেন না।

যাঁহারা এই পারিপার্শ্বিক দৃশ্যমান জগৎটাকেই সর্ব্বস্ব মনে করেন, ইহার আর আদিতে কিছু নাই, অন্তেও নাই—এই যাঁহাদের বদ্ধমূল ধারণা, বা এই ধারণা লইয়াই যাঁহারা সর্ব্বত্র চলেন—সকল কার্য্য, সকল অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন—তাঁহারাও এগ্রন্থ পড়িবেন না।

যাঁহারা যুক্তিতর্কে ঘাড় হেঁট্ করিতে চাহেন না, নিজের সিদ্ধান্তকে কোন অবস্থায়ই বদলাইতে রাজী নন, নিজের ভাল-মন্দ-বোঝার ওপরেই ষোলআনা যাঁহাদের নির্ভর—তাঁহারাও এগ্রন্থ পড়িবেন না।

এগ্রন্থ পড়িয়া তাঁহাদের ফল হইবে না।

দূর হইতে প্রুফ্ দেখার অসুবিধা বশতঃ এগ্রন্থের কোথায়ও কোথায়ও ছাপার ভুলও দৃষ্ট [illegible] পারে; আশা করি, এ ত্রুটীও মার্জ্জনীয়।

কাশীধাম, } গ্রন্থকারস্য

* "The man who narrows himself to 'light' literature who never reads a 'serious' book, misses one of the big joys that life holds"—('Daily Herald'—England).

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

হে ধনঞ্জয়, কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য হইয়া এবং (কর্ম্মের) সিদ্ধি-অসিদ্ধি বিষয়ে সমভাব অবলম্বন পূর্ব্বক যোগস্থ হইয়া সকল কর্ম্ম করিবে—এই সমত্বভাবটীকেই 'যোগ' বলা হয়।

গ্রন্থকার-প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থ

স্ত্রীপাঠ্য (পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক)

১। সাবিত্রী-সত্যবান (১৩শ সং)	২৲	৪। পদ্মিনী (৫ম সং)	১॥০
২। শৈব্যা (৮ম সং)	২৲	৫। ঐ (ছোটদের)	।০
৩। শর্ম্মিষ্ঠা (৪র্থ সং)	১৲	৬। অহল্যাবাই (ঐ)	।০

৭। মাতৃমঙ্গল ৸০

স্ত্রীশিক্ষামূলক

৮। কুললক্ষ্মী (১৬শ সং)	১৲	১০। সতীধর্ম্ম	১।০
৯। নারীলিপি (৫ম সং)	১।০	১১। নারীর স্বর্গ (২য় সং)	১৲

উপন্যাসাবলী

১২। বঙ্গবিজয় (২য় সং) *	১॥০	১৮। গ্রন্থিবন্ধন	১৲
১৩। বিধির মিলন (৪র্থ সং)	১৲	১৯। পত্নীলাভ *	১৲
১৪। পতিতা *	১॥০	২০। ইন্দুপ্রভা *	১৲
১৫। মনাক্কা *	১।০	২১। বরের বাপ	১৲
১৬। প্লাবন	৸০	২২। রাঙা বৌ *	১৲
১৭। পরিণয় (২য় সং)	১৲	২৩। পূজার ফুল (২য় সং)	১৲

২৪। মণিমালা (২য় সং) ১৲ টাকা

অন্যান্য

২৫। আরব্যোপন্যাসের গল্প (২য় সং) ॥০

২৬। তক্কেতাউস বা তাজমহল (নাটক)* ১।০

২৭। উত্তর-পশ্চিমভ্রমণ (পরিবর্দ্ধিত নূতন সং—যন্ত্রস্থ)

২৮। তারকেশ্বরতীর্থ-বিবরণ ৵০

২৯। Raye's Students' Annual & Directory, 1929 (ইং)* ১॥০

☛ * চিহ্নিত পুস্তকগুলি (সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায়) আপাততঃ অপ্রাপ্য।

গ্রন্থকারের 'নারীর স্বর্গ' বিষয়ক কতিপয় অভিমত

(Late) Maharaja Sir Manindra Ch. Nandi—"* * I have specially gone through his "Narir-Sarga" and can safely say that it is one of the best productions of the time, instructing the female mind towards what is the best to attain in womanhood. His style is simple, lucid and very attractive and thoughts are genuine and breathe morality. I appreciate his book and I hope, this sort of publication will do immense good to the society for which it is meant."

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর—"শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় বাঙ্গলা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত ; তাঁহার 'সাবিত্রী-সত্যবান', 'মাতৃমঙ্গল', 'কুললক্ষ্মী' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ জনাদর লাভ করিয়াছে। * * * তাঁহার 'কুললক্ষ্মী'গ্রন্থে নারীজীবনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে-সকল প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহারই নির্দ্দেশক্রমে নারীজীবনকে কর্ম্মের পথে চালিত করিয়া কেমন করিয়া সার্থক করা যায়, এই 'নারীর স্বর্গ' গ্রন্থে তাহাই অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে নারীজাতির শিক্ষা-দীক্ষা সম্বন্ধে যে আলোচনা চলিতেছে, সুরেন্দ্রবাবু এইগ্রন্থে সেই আলোচনা সম্বন্ধে অনেক যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, হিন্দুনারীর বৈশিষ্ট্য রক্ষাকল্পে যে যে উপায় অবলম্বিত হওয়া কর্ত্তব্য, সুরেন্দ্রবাবু তাহার সুন্দর পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।"

জন্মভূমি—"সংসারধর্ম্মাশ্রমে হিন্দুনারী কিরূপে স্বর্গসুখভোগের অধিকারিণী হইতে পারেন, সেইপথের পরিচয়ই এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থকার পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক স্ত্রীশিক্ষামূলক কয়েকখানি

উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যসংসারে সুপরিচিত। 'নারীর স্বর্গ' পুস্তকখানি আমরা অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। * * * পুস্তকখানিতে আমাদের হিন্দুসমাজের প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষাপ্রদ উচ্চ নৈতিক-আদর্শ সমভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে। সমাজে এরূপ পুস্তকের আমরা বহুলপ্রচার কামনা করি।"

বিশ্ববাণী—"হিন্দুনারীর জন্য লিখিত একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। বস্তুনিষ্ঠ গ্রন্থকার প্রকৃত দরদ লইয়াই ইহা লিখিয়াছেন। নারীর বেশভূষা, গৃহস্থালী, ব্যায়াম-চর্চ্চা, ব্রতপূজা নানা বিষয়ই সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। উপন্যাসপ্লাবিত বাঙ্গলায় এরূপ গ্রন্থের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। নারীর উন্নতি না হইলে, জাতির উন্নতি অসম্ভব। ইহা সর্ব্বজন বিদিত। মৃত্যুর তীরে দাঁড়াইয়া হিন্দুজাতি চিন্তা করিয়া দেখুক, নারীর উন্নতি আজ তার অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে কিনা। যদি হইয়া থাকে, হিন্দুর গৃহে গৃহে 'নারীর স্বর্গ' যোগ্য সমাদর লাভ করুক।"

সূচী

গোড়ার কথা

স্বকৃতাস্বকৃতং কর্ম্ম নিষেব্য বিবিধৈঃ ক্রমৈঃ।
দশার্দ্ধ প্রবিভক্তানাং ভূতানাং বহুধা গতিঃ॥

অর্জ্জুন গীতা

জীব সদসৎ নানা কর্ম্মদ্বারাই বহুবিধ বিভিন্নপ্রকার গতি লাভ করে।

নারীর কর্ম্মযোগ

উপক্রমণিকা
বা
গোড়ার কয়েকটী কথা

কর্ম্ম কাহার? সৃষ্টিকর্ত্তারই কর্ম্ম

যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন তাঁহারা অবশ্যই মানিয়া লইবেন যে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা তাঁহারই সৃষ্টি। তাঁহারই ইচ্ছায় চরাচর হইয়াছে, চরাচর চলিতেছে, চরাচরে যাহা কিছু ঘটিতেছে। চেতন-অচেতন সকল বস্তুর গতি তিনিই নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। অন্যান্য জীবের ন্যায় মানুষও তাঁহার ইচ্ছাতেই জগতে আসিয়াছে, এবং তাঁহারই কোনো লক্ষ্যপ্রতিপালনকল্পে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট নানা নিয়মাধীন এ জগতে চলিতেছে।

ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষ মাত্রেরই এ কথাটা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। যদি ঈশ্বর মান, তাঁর সর্ব্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস কর, একথাটা তোমায় স্বীকার করিতেই হইবে। আর যদি না কর, তুমি তো নাস্তিক, তাঁকে তুমি মানো না, এমন একজন জগৎস্রষ্টা সর্ব্বশক্তিমত্তা বিধাতা-পুরুষে তোমার আস্থা নাই, এ জগতের গতিবিধি, পরিবর্ত্তন-বিবর্ত্তন বা কার্য্যকারণ—তোমার হিসাবে কোনও বিচার-বিবেচনার উপর স্থাপিত বা কোনও বিশেষ লক্ষ্যাভিমুখী নয়।

কিসে বুঝিলাম ?—দিব্যচক্ষু ফোটাও।

এমন নাস্তিক জগতে যে নাই—একথাও বলা চলে না। এ শ্রেণীর মানুষ আজকাল মাঝে মাঝে দেখা যায় বটে। বলা যায়, চক্ষু থাকিতেও তাহারা অন্ধ। চর্ম্ম-চক্ষুতে ভগবানকে দেখা যায় না সত্য, কিন্তু এই চর্ম্মচক্ষুর অন্তরালে অনেক জিনিষই আছে (যথা—বায়ু, তাড়িৎ, উত্তাপ, গন্ধ ইত্যাদি) যাহাদিগকে বাহিরের চক্ষুতে দেখিতে পাই না, তবু অন্তরের বিচার-বিবেচনার দ্বারা ও অন্যবিধ ইন্দ্রিয়াদির সহায়তায় বেশই আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি। অপর ইন্দ্রিয়াদি-লব্ধ বিবিধ খণ্ডজ্ঞানগুলিকে বুদ্ধির দ্বারা সংযোজিত করিয়া অনেক অলক্ষ্য বস্তুর পরিচয় অনায়াসেই পাওয়া যায়। তখন এই বুদ্ধিকেই বলা হয়—অন্তরের দিব্যচক্ষু। ভগবানকে বাহিরের চক্ষুতে দেখিতে না পাইলেও অন্তরের এই দিব্যচক্ষুতে, মানুষ আমরা, যথেষ্টই তাঁহাকে অনুভব করিতে পারি। আর তবু যাহারা পারি না, তাহারা অবশ্যই ভ্রান্ত, চক্ষু থাকিতেও মহা-অন্ধ—বাহিরে চর্ম্মচক্ষুসম্পন্ন হইয়াও অন্তরের দিব্যচক্ষু হইতে চিরবঞ্চিত।

যাহারা এই দিব্যচক্ষু হইতে বঞ্চিত, তাহারা এই ভগবান কেন, জগতের অনেকানেক বস্তুর পরিচয় ও সন্ধান হইতেই বঞ্চিত। সামান্য দুইটি চর্ম্মচক্ষুর সহায়তায় এই বিরাট বিশ্বের কয়টা বস্তুরই-বা আর পরিচয় পাওয়া যায়! জগতে বেশীর ভাগ বড় বড় বস্তু ধরা পড়ে—ওই দিব্যচক্ষুরই সাহায্যে। সুতরাং এই দিব্যচক্ষুর মূল্য আমাদের এই চর্ম্মচক্ষুর মূল্য অপেক্ষা অনেকগুণে অধিক। আরও যে একটী কারণে এই দিব্যচক্ষুর মূল্যকে চর্ম্মচক্ষুর মূল্য অপেক্ষা অনেকগুণে অধিক বলা যায় তাহা এই যে, আমাদের চর্ম্মচক্ষু অনেক সময়েই আমাদিগকে অনেক ভুল ধারণার বশীভূত করিয়া দেয়, কিন্তু দিব্যচক্ষুর দৃষ্টি তত ভ্রান্ত নয়। চর্ম্মচক্ষুতে চন্দ্রসূর্য্য বা নক্ষত্রপুঞ্জকে যত ছোট বা যে আকারে আমরা দেখি, বস্তুতঃ তাহাদের আকার বা অবয়ব কি ঐরূপ? আমরা জানি, উহারা অনেক বড়

ও অনেক ভিন্ন প্রকৃতির বস্তু। চন্দ্র বস্তুতই একখানি উজ্জ্বল সোনার থালা নয়, নক্ষত্রগুলিও টুক্‌রো টুক্‌রো হীরকখণ্ড নয়। শুধু দর্শনেন্দ্রিয়-ঘটিত নয়, অপরাপর ইন্দ্রিয়লব্ধ নানা খণ্ডজ্ঞানের সহায়তায় আমাদের অন্তররাজ্যে জ্ঞানের যে দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত হয়, উহার সাহায্যেই জানিতে পারি, উহারা অনেক বড় বড় বস্তু ; চন্দ্র এই পৃথিবীর মতই অপর একটি সুবৃহৎ গোলক, এই পৃথিবীর মতই উহাতে পাহাড় আছে ও অপর অনেকানেক বস্তু আছে ; আর ওই সূর্য্য ও নক্ষত্রগুলিও আরও বহুগুণে বড় ও নানা তেজোময়-পদার্থ। আমাদের চর্ম্মচক্ষুর দৃষ্টিতে উহাদের সম্বন্ধে যে ধারণা মনে আসে উহা ঠিক নহে। কিন্তু ওই অন্তরের দিব্যদৃষ্টিতে যাহা আমরা বুঝি, উহা অনেকাংশে সত্য ও খাঁটী বটে। সুতরাং খাঁটিভাবে কোন বস্তুকে জানিতে বা বুঝিতে হইলে আমাদের চর্ম্মচক্ষুর সাক্ষ্য অপেক্ষাও ভিতরের দিব্যচক্ষুর সাক্ষ্য আমাদের নিকটে অনেক অধিক নির্ভরযোগ্য।

অতএব, এই দিব্যচক্ষুতে যদি ভগবানকে অনুভব করিয়া থাকি, তবে এই চর্ম্মচক্ষুতে না দেখিতে পাইলেও তাঁহাকে আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারিব না। বায়ুকে চক্ষে দেখিতে পাই না, কিন্তু ঝড়ে যখন একটা গাছ পড়িয়া যায়, তখন বুঝি—সে আছে ; ফুলের গন্ধ নাকে যখন ঢোকে, তাহাকে তখন দেখিতে বা স্পর্শ করিতে না পারিলেও শুধু যে তাহার অস্তিত্বই টের পাই তা'নয়, নানা ভিন্ন ভিন্ন গন্ধের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিও আমরা অনুভব করিতে পারি, উহাদের উগ্রতা ও মৃদুতাও লক্ষ্য করি, উহাদিগকে অস্বীকার করিয়া বলিতে পারি না—উহারা নাই। তাড়িৎশক্তি সম্বন্ধেও ঐরূপ বলা চলে এবং আরও অসংখ্য বস্তু সম্বন্ধেই বলা চলে।

দিব্যচক্ষু কি করিয়া ফুটে ?

ইহার পর আরও একটা বড় কথা আছে। আমাদের এই চর্ম্মচক্ষু ও দিব্যচক্ষুর অজ্ঞাতেও আরও বহু জিনিষ এজগতে থাকিতে পারে এবং

নিশ্চয় আছে। কোনো উপায়েই তাহাদিগকে আমরা জানিতে পারি না বলিয়াই উহারা যে নাই—এমন কথা বলা চলে না। ইহার প্রমাণ—কালে কালে এমন অনেক জিনিষের সন্ধানই আমাদের নিকট আসিতেছে, যাহার বিষয়ে হয়ত চিরকালই আমরা যথার্থই অজ্ঞাত ছিলাম। যতদিন টেলিগ্রাফ ছিল না, ততকাল ভাবিয়াছি, বুঝি এমন কোনো ত্বরিৎবার্ত্তাবহশক্তির অস্তিত্ব এ জগতে অসম্ভব, কিন্তু আজ উহার পরিচয় পাইয়া স্বীকার করিতেছি—না, উহা আছে। প্রতিনিয়ত অনেক জিনিষ সম্বন্ধেই এইরূপ ঘটিতেছে এবং কতকাল যে ঘটিবে, তাহারও কিছু ঠিকঠিকানা নাই। হয়ত কোটি কোটি বৎসর পরেও এইভাবই রহিবে, আরও অনেক জিনিষের অস্তিত্ব তখন পর্য্যন্তও অজ্ঞাত রহিয়াই যাইবে। সুতরাং আজ যাহা জানিতে পারিতেছি উহাই যে চূড়ান্ত এবং উহার বাহিরে যে আর কিছু নাই, এ ধারণা অমূলক। অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে, যে পর্য্যন্ত না কোনও জিনিষকে সত্য সত্য জানিতে পারা যায়, সে পর্য্যন্ত ঐ জিনিষটী ঠিক যে আছেই, একথা বলাও ভুল। যাহার পরিচয় কখনও পাই নাই, উহার সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলাই সঙ্গত যে, ঐরূপ কোনও জিনিষ আছে কিনা জানি না, থাকিলে থাকিতে পারে, আবার না থাকিলে না-ও থাকিতে পারে। না জানিয়াশুনিয়া, একদিকে ঐরূপ জিনিষ "আছেই" বলাও যেমন অনুচিত, পক্ষান্তরে আবার তেমনই "নাই" বলাও অসঙ্গত। কিন্তু এই 'আছে' বা 'নাই'-এর বিচারও কাহারও ব্যক্তিগত জানা-শুনার উপর করিলে চলে না। চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা প্রভৃতি নানা বাহ্য-ইন্দ্রিয়লভ্য সাক্ষাৎ-জ্ঞান, ও অন্তরের বুদ্ধি ও বিচারশক্তি হইতে জাত দিব্যচক্ষুপ্রদত্ত জ্ঞান—এই দুইটীকেই অনেক সময়ে আরস্বরূপ অপরের নিকট হইতেও গ্রহণ করিতে হয়। বাহিরের নানা ইন্দ্রিয় এবং অন্তরের বুদ্ধি ও বিচারশক্তি—এগুলি সমভাবে বা সমপরিমাণে সকলের ভিতর থাকে না; এমন কি, স্থলবিশেষে কোনো কোনোটীর পূর্ণাভাবও দৃষ্ট হয়।

এমন অনেক মানুষ আছে, যাহাদের দর্শনশক্তি আদবে নাই, এবং এমন লোকও আছে যাহারা জন্মাবধি বধির ; আর ক্ষেত্র বিশেষে বুদ্ধি ও বিচার শক্তির তারতম্যের উল্লেখটাতো না করিলেও চলে—উহারা প্রায় সর্ব্বত্র অসমান। এমনাবস্থায়, যেদিকে যাহার যতটুকু অভাব, অপরের নিকট হইতে ধার করিয়া উহা পূরণ করা ছাড়া আর গতি কি? আমি নিজে দেখিতে পাই না বলিয়াই চন্দ্র-সূর্য্য নাই, লাল-কালো নাই, পশু-পক্ষী নাই—এমত সাব্যস্ত করিয়া বসিয়া থাকিলে আত্মবঞ্চনা মাত্রই হইবে। এই রকম আমার শ্রবণশক্তি বা ঘ্রাণশক্তি নাই বলিয়াই মানুষের ভাষা নাই, মেঘগর্জ্জন নাই, ভালমন্দ গন্ধও নাই—এমত সব ধারণার বশবর্ত্তী হইলেও পদে পদে মিথ্যা জ্ঞানকেই পোষণ করা হইবে। অথচ এই জাতীয় ভুলের বশবর্ত্তী হইয়াই জগতের ছোট-বড় অনেকক্ষেত্রেই আমরা কিন্তু অহরহ অনেক গোলযোগ করিয়া থাকি। এ বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার। জন্মিয়া অবধি প্রায় সর্ব্বদাই ত দেখিতে পাই, অপরের অভিজ্ঞতা ধার লইয়াই জগতে আমাদিগকে অনেক গূঢ়-রহস্য ভেদ করিতে হয়—কেবলমাত্র নিজের অভিজ্ঞতা লইয়া অধিক দূর অগ্রসর হওয়া চলে না। বিদ্যালয়েও এইজন্য অপরের সংগৃহীত তত্ত্বাদিতে পূর্ণ পুস্তকাবলী সকলকেই পাঠ করিতে হয় এবং জীবনের প্রায় সর্ব্বস্তরে প্রকৃষ্ট গুরুরও এইজন্যই এত আবশ্যকতা দেখা যায়।

কিন্তু এই অকাট্য সত্য কথাটা সচরাচর স্বীকার করিলেও অনেক দরকারী ও গুরুতর ক্ষেত্রে কিন্তু সত্য সত্য আমরা ভুলিয়া যাই। এটা বড় ক্ষোভের কথা। এমন আমরা কহিতেছি না যে, আমাদের জ্ঞানের অভাব পূরণকল্পে যাহা কিছু অপরে দিবে, আমাদিগকে উহাই নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে হইবে। অপরের প্রদত্ত জ্ঞানও যথাসম্ভব আমাদিগকে যাচাই করিয়া লইতে হইবে বই কি? প্রত্যেকেরই কিছু-না-কিছু বুদ্ধি, বিচারশক্তি ও সাধারণ জ্ঞান আছেই আছে। এগুলিকেই কষ্টিপাতর

করিয়া উহাদের সহায়তায়ই অপরের দেওয়া ঐরূপ জ্ঞানসম্ভার যাচাই করিয়া আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হয়। ভুলভ্রান্তিবশে সব সময়েই হয়ত এ যাচাই ঠিক হয় না; না হউক, এতটুকু অসুবিধা স্বীকার করিয়াও এ পথে লাভ যাহা হয়, উহার মূল্য অপরিমেয়। এই অপরের দেওয়া জ্ঞানসম্ভারের বিচার শুধু আমাকেই একা করিতে হয় না। জগতের সমগ্র লোকের সম্মুখে বিচারের জন্য উহারা উন্মুক্ত থাকে এবং উহাদের কতটা খাঁটি, ও কতটা ঝুটা, সমগ্র জগতের লোক বিচারবিবেচনা করিয়া অনায়াসেই সে-সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতেও পারেন। একের বিচারে কোনরূপ ভুলভ্রান্তি ঘটিলে, একদিন না একদিন অপরের বিচারে সে ভুলভ্রান্তি ধরা পড়িবেই। সুতরাং অপরের দেওয়া জ্ঞানসম্ভারও—যাহা সত্যজ্ঞানরূপেই পণ্ডিতগণ কর্তৃক বহুকাল সম্মানিত—উহাও গ্রাহ্য।

দিব্যচক্ষুর দিব্যদৃষ্টি। ভগবান আছেন।

কিন্তু আসল কথা অনেকক্ষণ আমরা ছাড়িয়া আসিয়াছি, সে-কথা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্যগুলি সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্যই এই কথাগুলিও আগে বুঝানো দরকার—সেই জন্যই এত কথা বলিলাম। এইবার সে কথায় যাইতেছি। চর্ম্মচক্ষুতে না দেখিতে পাইলেও, ভগবানের সত্তা আমাদের অন্তরের দিব্যচক্ষুতে যথেষ্টই যে অনুভব করা যাইতে পারে, সে কথাটাই আপাততঃ আলোচ্য। প্রথমতঃ দেখিতে পাই, এই ঈশ্বর বিশ্বাসটা আবহমান কাল হইতেই জগতের ছোটবড় প্রায় সকল জাতির মধ্যেই কোনো না কোনো আকারে একটানা চলিয়া আসিতেছে। জিজ্ঞাস্য—সকল জাতির মধ্যে এমন একটা বিশ্বাস কি করিয়া আপনা হইতেই আসিল? তারপর, এজগতে দেশেদেশে এপর্য্যন্ত যত মহাপুরুষ ও জ্ঞানী লোক জন্মিলেন, প্রায় সকলেরই তো দেখি ঐভাব। ভগবানের স্বরূপপ্রকৃতি সম্বন্ধে উঁহাদের মধ্যে মতের তারতম্য

দৃষ্ট হইলেও, তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তায় ও সর্ব্বময়প্রভুত্বে সকলেই একই ভাবে পূর্ণবিশ্বাসী। এজগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ তিনিই—এ কথা সকলেই বিশ্বাস করেন এবং যিনি যত বড় তত্ত্বদর্শী ও দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, দেখা যায়, তাঁহার মধ্যেই এ বিশ্বাসটী সে পরিমাণে অধিকতর সুদৃঢ় ও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত ও প্রকট হইয়াছে। যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, সর্ব্বোপরি নিত্যসত্যাশ্রয়ী ও সাধু বলিয়া যাঁহারা সুপরিচিত—কি করিয়া তাঁহারা এমন সুদৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাসানুবর্ত্তী হইলেন? সাধু, সত্যাশ্রয়ী, তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণ প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্ব অবগত না হইয়াই খেয়ালবশে একটা মিথ্যাপ্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন—এমন অসার ধারণা মনে স্থান দেওয়া ও ইচ্ছা করিয়া আত্মবঞ্চনা করা একই কথা নহে কি?

নাস্তিকের ভুল

তৃতীয়তঃ, আমাদের মনে হয়, শুধুই মাত্র এই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারের নিমিত্তই এই সকল বাহিরের প্রমাণের তত আবশ্যকতা নাই। ভিতরের দিব্যচক্ষু আমাদের অন্তরে অন্তরে একটু উন্মিলীত করিয়া দেখিলে নিজেরাও আমরা এ বিষয়ে অনেকখানিই নিঃসন্দেহ হইতে পারি। জগতের সৃষ্টিকৌশলের নানা বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য করিলে এবং উহার নানাবিধি ব্যবস্থার শৃঙ্খলার প্রতি দৃষ্টি করিয়া একটু ধ্যানধারণামগ্ন হইলে অন্তরের দিব্যচক্ষুর দৃষ্টিতে আমরাও তাঁহাকে অনায়াসেই ধরিতে পারি। প্রতিনিয়ত এই যে চন্দ্রসূর্য্য একইভাবে উঠিতেছে ও একইভাবে অস্ত যাইতেছে, এই যে নানা জীব ও উদ্ভিদকুল একই প্রণালীতে একই আকারে জন্মগ্রহণ করিয়া একই ধারায় নানাবস্থাভেদ পূর্ব্বক আবার একই প্রণালীতে পঞ্চত্ব পাইতেছে, এই যে একই ধারায় একই নিয়মাধীন নানা বৃক্ষলতা-ফলফুল ও জড়পদার্থের ক্রমবিকাশ, ক্রমপরিবর্ত্তন,—এই যে

বিশ্বব্যাপী সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের মধ্যে একটা বিরাট শৃঙ্খলা ও বিধি-ব্যবস্থার অটুট বন্ধন—কে ইহাদিগকে প্রতিনিয়ত এমন নিপুণভাবে রক্ষা করিয়া রাখিয়াছে? কাহারও সতর্ক দৃষ্টি ও কঠোর শাসন ব্যতীত স্বতঃই উহারা আপনাদিগকে রক্ষা করিয়া আপনগতিতে চলিয়াছে—এও কি সম্ভব? নাস্তিকরা জবাব দিয়া থাকেন, এ সকল তো স্বভাবেরই লীলা; প্রকৃতির চিরন্তন শক্তিবশেই প্রতিনিয়ত এইরূপ হইয়া থাকে। এই নিয়ম ও শৃঙ্খলা প্রকৃতির কতকগুলি বাঁধা-ধরা নির্দ্দিষ্ট গতির ফলেই রক্ষিত হইয়া থাকে, কোনও উদ্দেশ্য লইয়া বা কোনও ভালমন্দ বিচার-বশে কেহ যে তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন—একথার কোনও প্রমাণ নাই। তাঁহাদের ভাব এই যে, এই প্রকৃতি ও জগদীশ্বরে অনেক প্রভেদ। জগদীশ্বর বলিতে যাহা আমরা বুঝি, এই প্রকৃতি বলিতে ঠিক তাহা বুঝায় না। প্রকৃতিতে এইরূপ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা আছে বটে, কিন্তু তাহার ভালমন্দ বিচার নাই; এই নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতার বাহিরে বা উহার নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্যে কোনও পরিবর্ত্তন বা ইতরবিশেষ ঘটাইবার হাতও তাহার নাই। সে যেমন আজ চলিতেছে, পূর্ব্বেও এইরূপ চলিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও এই একইভাবেই চলিবে—কেহ তাহার পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না, সে নিজেও নয়, আর কেহও নয়।

ঈশ্বরের স্বপক্ষে যখনই আমরা কিছু বলি, ঐভাবেই তাঁহারা উহার জবাব দিয়া থাকেন, কোনও চৈতন্যময় বা সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন প্রভু যে নিজের ইচ্ছানুরূপ এই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নিজের ইচ্ছানুরূপই ইহার পরিচালনা করিতেছেন, সে-কথা স্বীকার করিতে তাঁহারা নারাজ। কিন্তু তাঁহাদের এ বিচার অশ্রদ্ধেয়। আচ্ছা, এমন একটা চৈতন্যহীন, বিচার-বিবেচনাহীন অন্ধশক্তির সৃষ্টিতে কতকগুলি বিচিত্র ব্যবস্থা কোথা হইতে আসিল? মানুষ না জন্মিতে তাহার ভবিষ্যৎ অভাব অভিযোগের দিকে চাহিয়া প্রসূতির বুকের মধ্যে কে দুধ পুরিয়া দেয়?

জীবজন্তু মাত্রেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সুকৌশলে কে এমন যন্ত্রপাতি স্থাপিত করিয়া দেয়—যাহার এতটুকু নড়চড় হইলেই সব বিফল হইয়া যাইবে? উহাদের আবশ্যক বুঝিয়া তন্ন-তন্ন করিয়া তাহাদের হাত-পা ও চক্ষুকর্ণগুলি এমন নির্ভুল ও পরিপাটিরূপে গঠন করিয়া দেয় কে? আর নিজ সন্তানের প্রতিই বা পিতামাতার স্নেহমমতা এত অধিক হয় কেন? অপরের সন্তানের প্রতি তত হয় না কেন? একই ধাতুতে গঠিত—একই প্রণালীতে জাত সেই সকলেই তো সেই মানুষ! অনেক ইতর জন্তুর মধ্যে দেখা যায়, যতক্ষণ না উহাদের শাবকগুলি পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া আত্মরক্ষায় সমর্থ হইতেছে, তাহাদের সন্তান-বাৎসল্যের অবধি থাকে না, কিন্তু বয়স্ক হইয়া শাবকগুলি আত্মরক্ষাক্ষম হইতে হইতেই সেভাবে তাহাদের ভাটা পড়ে। এই সন্তান-বাৎসল্যটাও ঐ স্বভাবেরই দান হয় তো, আবশ্যকানুযায়ী ঠিক ওই নির্দ্দিষ্ট একটা গণ্ডী পার হইতে হইতেই আর উহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না কেন? যে-সৃষ্টির মূলে এত বিচিত্র রহস্য, এত সব পূর্ব্বাপর বিচারের আভাস—সে কি শুধুই একটা ঐ স্বভাবের মত অন্ধশক্তির বিকাশ মাত্র—আর কিছুই নয়? একটু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে সামান্য কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের মনও একথায় সায় দিতে চাহিবে না। এই বিচিত্র সৃষ্টির মূলে এমন কোনও চৈতন্যময়, ইচ্ছাময় ও বিচারশক্তিশীল সর্ব্বনিয়ন্তার হাত নিশ্চয়ই আছে, যাঁহার ইচ্ছাতেই সকল হইয়াছে, এবং সকল হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এই যে কতকগুলি বিধিবদ্ধ নিয়মে জগৎ চলিতেছে, এগুলিও তাঁহার এই উদ্দেশ্যমূলক ব্যবস্থারই নানা ফল; তাঁহার ব্যবস্থায়ই এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে উহারা চলিতেছে, এবং যতকাল এই ভাবে চলিবে, তাঁহার ইচ্ছাতেই চলিবে, তাঁহার অনভিপ্রায়ে একদিনও চলিতে পারিবে না, বা চলিবে না।

মানুষের ওপর ভগবানের ভার

কিন্তু যে প্রসঙ্গে এইসব কথা আমরা তুলিয়াছি, উহা বুঝাইবার জন্যই এইখানে এ সম্পর্কে আরও দু'একটী কথার উল্লেখ করা আবশ্যক। ভগবান তাঁহার এই বিরাটসৃষ্টি রক্ষাকল্পে যে সকল সুকৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই একটা অতি বিশেষ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় যে— তাঁহার সৃষ্টির নিগূঢ়রহস্য শেষ পর্য্যন্ত রক্ষাকল্পে তাঁহার নিজের দায়ীত্ব অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণেও মনুষ্যজাতির হস্তে তিনি ছাড়িয়া দিয়াছেন। মানুষ যেমন অনেক 'কল-কব্জা' সৃজন করিয়া নিজের মতলব মত অনেক কাজকর্ম্ম এই 'কল-কব্জা'গুলির দ্বারাই আদায় করিয়া লয়, এও যেন ঠিক তাই। মনুষ্যরূপী 'কল' সৃষ্টি করিয়া এবং উহাতে 'বিবেক'রূপ পরিচালক ও 'স্বাধীন-ইচ্ছা'রূপ কয়লা ও জল, বা তাড়িৎশক্তি দিয়া উহাকে তিনি চালাইয়া দিয়াছেন এবং উহার মারফতই যথাসম্ভব অনেক কাজ আদায় করিয়া লক্ষ্যমুখে চলিয়াছেন। কয়লার দোষগুণে বা তাড়িৎশক্তির তারতম্য বশতঃ, অর্থাৎ মনুষ্যবিশেষের এই 'স্বাধীন-ইচ্ছা'র (free will) যোগ্য বা অপব্যবহার হেতু, এই কাজ-আদায়ের গতিটা কখনও কখনও স্থলবিশেষে লঘু-গুরু হইয়া পড়ে বটে; এবং তখনই, আমাদের এই কলগুলার মালীকদের মত তাঁহাকেও হয়ত সময় সময় বিব্রত হইয়া সংস্কার-উদ্দেশ্যে আমাদের সম্পর্কে আবশ্যকানুরূপ অল্পাধিক রক্ষানীতিও অবলম্বন করিতে হইয়া থাকে।

একমাত্র মানুষই তাঁহার এ অমূল্য আশীর্ব্বাদের অধিকারী। এ সম্পর্কে মানুষের কর্ত্তব্য।

যাহা হউক, এ রূপকের কথার আর প্রয়োজন নাই। রূপকে বহু দূর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। মোটকথা এই যে, এ পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র মানুষই তাঁহার পরমপ্রসাদস্বরূপ এই 'স্বাধীন-ইচ্ছা'র অমূল্য

দান পাইয়া ধন্য হইয়াছে এবং কাজেকাজেই মানুষের নিজের সুখ-দুঃখের দায়ীত্বভারটাও বহুল পরিমাণে এজন্য তাহার উপরই আসিয়া পড়িয়াছে। জগদীশ্বরের এ বিশেষ দানটী মনুষ্য ব্যতীত আর কোনও জীবকে তিনি দিয়াছেন কিনা বলা যায় না। এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার জীবসৃষ্টি এই একমাত্র পৃথিবীতেই যে সীমাবদ্ধ এমন মনে করিবারও হেতু নাই। হয়ত আমাদের পরোক্ষে এবং অন্যান্য দৃশ্য ও অদৃশ্য লোকে এমন অনেক সৃষ্ট জীবও আছে, যাহারা আমাদের অপেক্ষাও অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ, এবং অপরাপর অনেক শ্রেষ্ঠতর অধিকারের দান পাইয়া আরও ধন্য হইয়াছে। যাঁহাদিগকে আমরা দেবতা বলি, হয়ত তাঁহারা এই শ্রেণীটীরই অন্তর্ভুক্ত। হয়ত এই মানুষও যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়া কখনও না কখনও তাঁহারই অনুগ্রহে সেইসকল শ্রেষ্ঠতর পদেও উন্নীত হইতে পারে এবং এইভাবে ক্রমে তাঁহার অধিকতর সন্নিকটবর্ত্তীও হয়। কিন্তু সে সকল পরোক্ষ লোক ও পরোক্ষ জীবের কথায় আপাততঃ অনাবশ্যক। এ পৃথিবীতে যতদূর আমরা দেখিতে পাই, একমাত্র মনুষ্যই তাঁহার এই অমূল্য দান—'ইচ্ছার স্বাধীনতা'র—অধিকারী, এবং এই 'ইচ্ছার স্বাধীনতা' পাইয়া সে তাহার আপন সুখদুঃখ, ভাল মন্দের দায় নিজ ঘাড়ে লইয়াছে। ভগবানের নির্দ্দেশ ও ইঙ্গিতানুযায়ী কি ভাবে এই 'স্বাধীন-ইচ্ছা'র সদ্ব্যবহার করিয়া মানুষ এই পরমদানের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে ও সঙ্গে সঙ্গে নিজেও দায়মুক্ত ও ধন্য হইতে পারে—এই লক্ষ্যটীই সংসারে আসিয়া সর্ব্বোপরি স্থির রাখা কর্ত্তব্য।

আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে অনাবশ্যক

কিন্তু বিপদ এই যে, মানবরূপী এই কলটী দিয়া ভগবান যে সত্য সত্য কি ইষ্টসাধন করিতে চান, কোথায় যে তাঁর শেষ লক্ষ্য—তাহা নির্ণয় করাই বড় দুরূহ; দুরূহ কেন—একপ্রকার অসাধ্য বলিলেও ত্রুটী হয় না।

অনেক গবেষণা ও অনেক তর্ক-বিতর্কের পরও একথার সত্য মীমাংসা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। নানা যুক্তি-তর্কের পরও এপর্য্যন্ত যাহা কিছু স্থিরীকৃত হইয়াছে, বলা যায়, উহারাও অনুমান মাত্র। বস্তুত, এতবড় কথার মীমাংসা মানুষ তাহার সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও সসীম বুদ্ধি লইয়া করিতে পারে না, কখনও পারে নাই, কখনও পারিবেও না। প্রশ্ন হইতে পারে, মানুষের এ দায় মানুষ তবে কি করিয়া বহন করিবে? আমাদের নিকট ভগবান কি চান, কি তাঁহার অভিপ্রায়—যদি তাহাই না বুঝিলাম, তবে এই 'স্বাধীন ইচ্ছা' লইয়াই বা তাঁহার লক্ষ্য কিভাবে অনুসরণ করিব? আপাতঃদৃষ্টিতে অভিযোগটা যুক্তিযুক্ত মনে হয় বটে কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। বলা যায়,—না-ই বুঝিলাম সেই তাঁর শেষ চরম উদ্দেশ্যটীকে। শেষ পর্য্যন্ত কি উদ্দেশ্যে কোথায় তিনি জগৎকে—তাঁহার এই সৃষ্ট বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে—ঠেলিয়া লইয়া যাইবেন, সামান্য আদার ব্যাপারী আমরা, সে জাহাজের খবরে এতই কি প্রয়োজন? যে মহাজন হইতে আদা পাই, আর যে ক্রেতাগণকে আদা বেচি, উহাদের সঙ্গে দেনা-পাওনা ঠিক রাখিয়া চলিতে পারিলেই তো হইল। অবশ্য, গোড়া ঘরের খবর জানা থাকিলে কাজকর্ম্মে কিছুটা সুবিধা-সুযোগ অধিক পাওয়া যায় বটে—সে কথা স্বীকার্য্য। কিন্তু যথায় সে-খবর অপ্রাপ্য, তথায় সন্তুষ্টচিত্তে ও একলক্ষ্যে আপনার কর্ত্তব্যের গণ্ডীতে প্রাণপণে কর্ম্ম করিয়া গেলেও কর্ত্তব্যপালন করাই হইবে, এবং ইহার অধিক কেহ কাহার নিকটে প্রত্যাশাও করেন না নিশ্চয়।

যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া কোনও সামান্য সৈনিক যদি সেনাপতির সমগ্র রণনীতির আলোচনা করিয়া তবে তাঁহার হুকুম প্রতিপালন করিতে প্রবৃত্ত হয়, বা কোনও পুলিসকর্ম্মচারী সরকারের আদেশ-প্রতিপালনের পূর্ব্বে তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেটীর শেষলক্ষ্য কোথায় উহাই ঠিক করিতে বসেন, অথবা কোনো রাজদপ্তরের কেরাণী তাঁহার লেখ্য কোনও কাগজে

কলমের আঁচরটী বসাইবার পূর্ব্বে উহাদ্বারা কোথায় কি মতলব সিদ্ধ হইতে পারে—পূর্ব্বাংশে সেই কথাটীই জানিয়া লইতে ব্যগ্র হয়—তবে সে-সব ক্ষেত্রে কি গোলযোগই না বৃদ্ধি পাইয়া থাকে! প্রকৃত কার্য্যসিদ্ধি তথায় হয় কতটুকু ?

কর্ম্মের প্রেরণা তাঁহার নিকট হইতে আপনিই আইসে।

সুতরাং প্রকৃত আবশ্যকতার দিক হইতেও ভগবানের স্বষ্টিরহস্যের সকল তত্ত্ব জানা মানবের পক্ষে যে নিতান্তই অপরিহার্য্য এ-কথাও স্বীকার করা যায় না। তবে প্রত্যেক মানবের পক্ষেই এইটুকু অন্ততঃ অবশ্য জ্ঞাতব্য যে—তাহার এই সীমাবদ্ধ জ্ঞান, বুদ্ধি ও শক্তি লইয়া, তাহার এই সীমাবদ্ধ জীবনে আপনাকে সে কিভাবে কর্ম্মপ্রবাহে লিপ্ত করিয়া দিতে পারে? এবং সে-সম্বন্ধে তাহার ওপরওয়ালা সেই সর্ব্বময়-প্রভু স্বষ্টিকর্ত্তার আদেশইঙ্গিতগুলাই বা কিরূপ!

সে আদেশ-ইঙ্গিত ভগবান যে আমাদিগকে দেন নাই—একথা বলাও সঙ্গত নয়। সে আদেশ-ইঙ্গিত তাঁহার নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে ও নানা উপায়ে প্রতিনিয়তই আমরা পাইয়া থাকি।

আমাদের মনে সুখ-দুঃখের ভাব ও সঙ্গে সঙ্গে বিচার-বুদ্ধি দিয়া ভগবান স্পষ্টভাবেই যেন আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন—কোন্ পথে আমাদিগকে চলিতে হইবে ও কোন্ কোন্ পথ পরিত্যাজ্য, কোন্ কোন্ বস্তু শ্রেয় ও প্রেয় এবং কোন্ কোন্ বস্তুইবা নিকৃষ্ট ও হেয়। সঙ্গে সঙ্গে 'বিবেক' নামক একটী পদার্থ দিয়া এ ইঙ্গিতটাকে আরও যেন তিনি অধিকতর সুব্যক্ত ও সুস্পষ্ট করিয়াই দিয়াছেন।

বস্তুতঃ এইসব সুখদুঃখের ভাব হইতেই আমাদের মধ্যে যত কিছু কর্ম্ম-প্রেরণা আসিতেছে। এই প্রেরণা সেই ভগবানেরই প্রদত্ত। ভাল

যাহা, মঙ্গলময় যাহা, সুন্দর যাহা—উহা পাইতে আমরা কেমন আপনা হইতেই ব্যগ্র ও অধৈর্য্য হইয়া উঠি এবং তদর্থেই যতকিছু কাজকর্ম্মে প্রবৃত্ত হই। আর যাহা অমঙ্গলকর, কষ্টদায়ক ও কুৎসিত, আপনা হইতেই উহাকে সর্ব্বদা বর্জ্জন করিতে ও এড়াইয়া চলিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি। এ বিদ্যা অপর কেহই আমাদিগকে শিখাইয়া দেন নাই, সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ভগবানই আমাদিগকে এই ভাবের মতিগতি দিয়া তবে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন; সুতরাং মানুষের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এটা তাঁহারই সর্ব্বপ্রধান ইঙ্গিত। এই ইঙ্গিতের বলেই মানুষ যতকিছু করিতেছে।

বিচার-বিবেচনার দ্বারা ইঙ্গিত ধরিয়া কাজ করা চাই।

কিন্তু এই ইঙ্গিতের পথটা আপাতঃদৃষ্টিতে যতটা সরল বা সহজ বলিয়া মনে হয়, বস্তুত কিন্তু তাহা নহে। এ পথটা সত্য-সত্য চিনিয়া চলাও অনেক বিচার-বিবেচনা ও দিব্যদৃষ্টি সাপেক্ষ। সকলেই আমরা সুখের অনুসরণে ব্যস্ত হই, কিন্তু কিসে যে সত্য সত্য সে-সুখ আছে এবং কিসে যে সত্য সত্য দুঃখের আবির্ভাব হয়—সকল সময়ে তাহা ধারণা করিয়া উঠিতে পারি না। অনেক সময় দুঃখের ভিতর দিয়াও সুখ আসে; আবার দেখা যায়, অনেক সময় সুখের ভিতর দিয়াও দুঃখ দেখা দেয়। এই সুখকে পাকাভাবে পাইবার জন্যই অনেক সময় অনেকপ্রকার দুঃখ ভোগ করারও প্রয়োজন। কিন্তু ক্ষণিক অস্থায়ী সুখের প্রলোভনে পড়িয়া অনেক সময় পাকা দুঃখকেই আমরা নিমন্ত্রণ করিয়া আনি। এমতস্থলে ভগবানের ইঙ্গিতের মর্য্যাদা অবশ্যই সত্য সত্য রক্ষিত হয় না। "সুখই তোমার কামনা, সুতরাং এই সুখকে যাহাতে পাকাভাবে আয়ত্ত করিতে পার তাহাই তোমাকে করিতে হইবে"—এটাই তাঁহার ইঙ্গিত। সুতরাং এইভাবে চলিতে গেলে পথে অনেক বিচার-বিবেচনারই আবশ্যকতা।

মানুষকে 'ইচ্ছার স্বাধীনতা' দিয়াছেন বলিয়াই, এতটুকু বিচার-বিবেচনার ভারও তাহার উপরই তিনি ফেলিয়াছেন; এবং যতক্ষণ না মানুষ পূর্ণ ভাবে এই ভার বহন করিয়া তাঁহার এই ইঙ্গিতের মর্য্যাদা পুরোপুরি রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, কখনও তাহাকে রেহাইও দিবেন না। সুখ খুঁজিতে খুঁজিতেও, তাই দেখি, অধিকাংশ মানুষ ওই দুঃখের পঙ্কেই প্রায় পড়িয়া থাকে। ফলে বহুক্ষেত্রেই একদিকে যেমন ভগবানের ইঙ্গিত প্রতিপালিত হইতে অনেক অযথা বিলম্ব হয়, পক্ষান্তরে মানুষের কষ্টও দীর্ঘস্থায়ী হইয়া উঠে।

সত্যবিচারের নিমিত্ত সত্যজ্ঞান আবশ্যক।

কিন্তু এতদুভয়ের কোনটাই বাঞ্ছনীয় নয়। কর্ম্মজীবনে সত্য বিচার-বিবেচনার অভাব যাহাতে না ঘটে, প্রত্যেক মানুষেরই সেইদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। আবার এই বিচার-বিবেচনার সহায়তাকল্পে প্রচুর জ্ঞানলাভেরও প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই জ্ঞান ভিতর ও বাহির—এই উভয় দিক হইতেই সংগ্রহ করিতে হয়; নিজের ধারণা, বুদ্ধি ও বিচারশক্তি হইতে যেমন সংগ্রহ করিতে হয়, আবার যুগে যুগে অপরের জ্ঞানকোষ হইতেও তেমনই আহরণ করিয়া লইতে হয়।

জ্ঞান লাভ কিসে হয়?

এই যুগে যুগে সংগৃহীত জগতের জ্ঞানকোষ আমাদের নিকট সর্ব্বদা লোকমুখে বা পুঁথিপত্রেই বাহিত হইয়া আইসে। বহুপ্রাচীন কথাগুলি আমাদের নিকট এইভাবেই উপস্থিত হয়। "একের মুখে শুনিয়া আর, আবার আর-এর মুখে অন্য"—এই ভাবেই প্রাচীন অনেক জ্ঞানসম্পদ্ আজ পর্য্যন্তও পুরুষানুক্রমে আমাদের দ্বারে পৌছিতেছে। কিন্তু কি লোকমুখে,

কি পুঁথিপত্রে অনেক সময় অনেক প্রকৃতকথা ক্রমে বিকৃতিভাবাপন্ন হয়—ইহাও দেখিতে পাই, সুতরাং এজন্য সতর্কতা, আলোচনা ও অনুশীলনেরও প্রয়োজন। এই অনুশীলনের জন্যও বাহিরের দশের মতামত ও নিজের জ্ঞানবুদ্ধির সহায়তা—সর্ব্বকালেই প্রয়োজনীয়।

সুতরাং প্রথমে প্রয়োজনীয় জ্ঞানানুশীলন এবং তৎপর এই জ্ঞানের সাহায্যে বিচার-বিবেচনা করিয়া মানুষ যদি—যে ভাবে এসংসারে স্থায়ী দুঃখকে পরিহার করিয়া স্থায়ী সুখকে আয়ত্ত করিতে পারা যায়—সেই পন্থার অনুসরণ করে, তবেই বিধাতার ইঙ্গিত সত্যসত্য প্রতিপালিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষও তাহার আপন দায়ীত্বভার হইতে মুক্ত হইয়া ধন্য ওসফলজীবন হইতে পারে, এবং তাহার চিরকাম্য সুখও চিরকালের জন্য তাহারই থাকিয়া যায়।

লক্ষ্য এক, কিন্তু কর্ম্মপন্থা সর্ব্বত্র এক নয়।

এই সুখের অন্বেষণের বা কর্ত্তব্যের পন্থা সকলেরই জন্য যদি এক হইত তবে বড় ভাবনা ছিল না। কিন্তু জীববিশেষে, ব্যক্তিবিশেষে, জাতি-বিশেষে, ক্ষেত্র বিশেষে, এমন কি দেশকাল ও পাত্র বিশেষেও—প্রায় অহরহই দেখা যায়—ইহারা স্বতন্ত্র এবং ইহা লইয়াই যত গোলযোগ। প্রত্যেক জীবের বা প্রত্যেক জাতীয় মানুষের দৈহিক বা মানসিক সামর্থ্য একরূপ নয়; দেশ, কাল এবং জাতি হিসাবে মানুষের কাম্যবস্তুর মধ্যে পার্থক্য আছেই এবং ইহাও দেখা যায় যে পারিপার্শ্বিক ঘটনাস্রোতের প্রবাহে বাধ্য হইয়া আমাদিগকে অনেক সময় অনেক সরলপথের পরিবর্ত্তে কৃত্রিম পথেরও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং কর্ত্তব্যের পথ মানবের পক্ষে অনেক সময়েই স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র, এবং অনেক সময় ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে—ইহা যেমন ব্যক্তিহিসাবে স্বতন্ত্র, তেমনই জাতিহিসাবেও অনেক ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র।

কর্ত্তব্য পন্থার দুইটী সুস্পষ্ট স্বতন্ত্র ধারা

আবার এত সব স্বাতন্ত্র্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও, মোটামুটি সকল মনুষ্যসমাজের মধ্যেই যে স্ত্রী-পুরুষঘটিত দুইটা প্রকাণ্ড বিভাগ আছে, এবং সে অনুযায়ী সর্ব্বশ্রেণীর মানবের মধ্যেই কর্ত্তব্যপন্থার দুইটী সুস্পষ্ট ধারা স্বভাবতঃ দৃষ্ট হয়—এ সত্যটা আরও লক্ষ্যণীয়।

বিভিন্ন সম্প্রদায় ঘটিত এত সব স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কর্ত্তব্যপন্থার নির্দ্দেশ—সহজসাধ্য ব্যাপার নহে, ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যের প্রসঙ্গ তো বাহির হইতে তোলাই ভুল। কোনও একটা শ্রেণীকে ধরিয়া উহার এমন সব সাধারণ ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কর্ত্তব্যগুলিরই মাত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে যাহা কোনও নির্দ্দিষ্ট কালে, নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে বা নির্দ্দিষ্ট অবস্থায়ই উক্তশ্রেণীর সর্ব্বসাধারণের অবলম্ব্য।

আমাদের আলোচ্য

কিন্তু এই গ্রন্থে আমরা তদপেক্ষাও একটা ক্ষুদ্রতর গণ্ডীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধেই আলোচনা করিতে আজ প্রবৃত্ত হইয়াছি। বর্ত্তমান কালে বাঙলার নারী-সমাজের কর্ত্তব্যপন্থা কিরূপ, এবং কিরূপ ভাবেই বা এ পন্থায় চলিয়া বঙ্গ-নারী কর্ম্ম-যোগ সাধনায় সিদ্ধিলাভ পূর্ব্বক জীবনযাত্রাকে সার্থক ও কল্যাণময় করিয়া তুলিতে পারে—এই "নারীর কর্ম্মযোগ" গ্রন্থে সে বিষয়েই যথাশক্তি ও যথাবুদ্ধি আমরা পথ নির্দ্ধারণে যত্নপর হইব এবং আমাদের বক্তব্যগুলিকে সুস্পষ্ট করিবার জন্য আবশ্যকবোধে মাঝে মাঝে একটু আধটু যুক্তিতর্ক ও আলোচনারও অবতারণা করিব।

এই আলোচনা ও যুক্তিতর্কমূলক অংশগুলি অনেক সময়ে একটু নীরস ও কঠিনবোধ্য হইলেও পাঠিকাঠাকুরাণীরা উহাদিগকে না উপেক্ষা করেন—এই আমাদের অনুরোধ। কথাগুলি অনেকাংশে জটীল ও নীরস হইলেও বর্ত্তমান নারীসমাজের অবশ্যজ্ঞাতব্য। নানালোকে নানাভাবে

এই সব প্রসঙ্গে আজকাল কথা কহিতে সুরু করিয়াছে, উহাদের কাহার কোন্ কথাটি কতখানি খাঁটী—যেখানে যেটুকু যুক্তিতর্ক আছে শুনিয়া—বিচার করিয়া না দেখিলে ফল হইবে না। আমাদের কথাই হউক বা অপরের কথাই হউক, কেহ কিছু অন্ধভাবে গ্রহণ করিয়া বিপথগামী বা ভ্রান্ত হউন—ইহা আমাদের ইচ্ছা নহে।

নারীর কর্ম্মক্ষেত্র

—*—
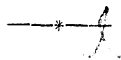
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

মহাভারত

কে জানে নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণ।
সেই পথ গ্রাহ্য যাহে যায় মহাজন॥

নারীর কর্ম্মযোগ

নারীর কর্ম্মক্ষেত্র

কর্ম্ম কি? যোগ কি? 'কর্ম্মযোগ' কাহাকে বলে?

কর্ম্ম কি?

"নারীর কর্ম্ম-যোগ" কথাটা বুঝিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমেই, 'কর্ম্ম' কি, এবং এই 'যোগ' কথাটার মানেই বা কি—এই দুইটী তত্ত্বেরই সন্ধান লওয়া দরকার।

'কর্ম্ম' কথাটা সাধারণভাবে অল্পবিস্তর সকলেই আমরা বুঝিয়া থাকি, কিন্তু জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ ইহাকে যে আরও একটু বিশেষ অর্থে বুঝিয়া থাকেন, এস্থলে সে কথাটারও আভাস দেওয়া কর্ত্তব্য।

পণ্ডিতের ব্যাখ্যা

পণ্ডিতেরা কহেন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির নাড়াচাড়া দ্বারা নূতন যে কিছু অবস্থার সৃষ্টি করা হয়, উহারাই কেবলমাত্র কর্ম্ম নহে। কর্ম্ম বলিতে শুধু সকল ইন্দ্রিয় বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরই নয়, প্রত্যুত মন ও অন্তরের প্রত্যেক ক্রিয়াটীকেও বুঝায়। তাঁহাদের মতে কর্ম্মব্যতিরেকে জীবের একমুহূর্ত্তও অতিবাহিত হয় না। এমন কোন অবস্থা নাই, যে অবস্থায় জীব কিছু-না-কিছু কর্ম্ম না করিতেছে। ধর, কোন কালে, নিতান্ত নিথর-নিষ্কম্প ভাবে হাত-পা গুটাইয়া তুমি চুপটী করিয়া একটা জড় প্রস্তরমূর্ত্তির মত বসিয়া, দাঁড়াইয়া বা শুইয়া রহিলে। তুমি বলিবে, সে-অবস্থায় তুমি কিছুই

করিতেছ না, কিন্তু পণ্ডিতগণ একথা কিছুতে স্বীকার করিবেন না। তাঁহারা বলিবেন, এই নিথর-নিষ্কম্প অবস্থায়ও অনেক-কিছু তুমি করিতেছ; তোমার ফুস্‌ফুস্ নিশ্বাস-প্রশ্বাস টানিয়া লইতেছে ও ফেলিতেছে; তোমার চক্ষু দর্শন করিতেছে ও পলক ফেলিতেছে, তোমার কান শব্দ শুনিতেছে, তোমার মন কতক[illegible] ভাবিতেছে ও কতদিকে ছুটিতেছে, তোমার অন্তরে সুখ-দুঃখের না[illegible] তরঙ্গ খেলিতেছে—ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহাদের মতে ইহারাও কর্ম্ম, কেননা—ইহাদের দ্বারাও নাকি সত্বরে হোক বা বিলম্বে হউক কোনওদিকে কিছু-না-কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াই থাকে। কথাটা যে একেবারে মিথ্যা নয়[illegible] বিশেষে অল্পবিস্তর আমরাও তাহা বুঝিতে পারি। এইরূপ নি[illegible]প ক্রিয়ার ফলেও অনেক সময় জীবের ও জগতের ভালমন্দের কারণ জন্মিয়া থাকে।

আমাদের লক্ষ্য

কিন্তু যাক্, অত সূক্ষ্ম কথায় এইক্ষণ নিষ্প্রয়োজন। সাধারণ ভাবে কর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝায়, আজ আমরা উহা লইয়াই কথা বলিব। তবে, এশ্রেণীর যাবতীয় কর্ম্মের বিষয় আলোচনা করাও এ-গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। জীবনকে উন্নতি ও সার্থকতার পথে লইয়া যাইবার জন্য গৃহস্থ-জীবনে নারীকে যাহা কিছু করিতে হয় উহাদের সম্বন্ধে যথাসাধ্য উল্লেখ ও আলোচনা করাই আজ আমাদের উদ্দেশ্য।

যোগ কি? লঘু ও গুরু ব্যাখ্যা

অতঃপর 'যোগ' কি—এ কথাটার তত্ত্ব লওয়া যাক্। এই 'যোগ' কথাটীরও গুরু ও লঘু—এই দুই জাতীয় দুইটী ব্যাখ্যা আছে। যাহারা অঙ্ক কষিতে জানেন, এই 'যোগ' কথাটার সহিত তাহারা অবশ্যই কতকাংশে পরিচিত। দুই-এর সঙ্গে দুই মিশাইলে চার হয়, পাঁচের সঙ্গে সাত

মিশাইলে বার হয়—ইহারই নাম যোগ ; অর্থাৎ একের সঙ্গে আর একটিকে মিশাইয়া দেওয়া বা জুড়িয়া দেওয়া। অঙ্কপুস্তকে শুধু সংখ্যাদির সম্পর্কেই এ কথাটীর উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু অপরাপর ক্ষেত্রেও এইরূপ। ভাতের সঙ্গে ডাল মেশাও, বা পানের সঙ্গে চূণ মেশাও, বা লাঙ্গলের সঙ্গে গরু জুড়িয়া দাও—ঐ সকলকেও যোগ করা বলা হইবে। ক্রমে মনের সম্পর্কেও ঐ কথাটীর ঐ ভাবেরই ব্যবহার হইয়াছে। পিতা-মাতা বা গুরু ব্যক্তিরা যখন উপদেশ দিয়া তোমাকে বলিবেন—'মনোযোগ করিয়া লেখা-পড়া করিও'—ঐখানেও যোগ কথাটীর মানে—ওই ধরিতে হইবে। অর্থাৎ, যখন লেখা-পড়া করিবে, মনকে তখন অন্য দিকে লইয়া যাইও না, ঐ কার্য্যের মধ্যেই লিপ্ত করিয়া রাখিবে। 'যোগ' শব্দের ইহাই হইল লঘু বা চলিত ব্যাখ্যা। ক্রমে ইহা হইতেই কথাটার অপর একটা বিশেষ অর্থও দাঁড়াইয়াছে। একাগ্রভাবে কোনও উদ্দেশ্যকে সফল করিবার নিমিত্ত যে কাহারও ঐকান্তিক কামনা ও চেষ্টা, এবং সেজন্য মনকেও অহরহ সেই দিকে চালিত করা—তাহারও নাম যোগ। সাধু-মহাত্মা ও দার্শনিকগণ আবার আরও একটু উচ্চ অর্থে এই শব্দটীর প্রয়োগ করিয়া থাকেন। মনে-প্রাণে কোনও বিশেষ পথে নিজকে লিপ্তকরিয়া দিয়া কঠোর সাধনার দ্বারা ভগবানকে যে পাইবার চেষ্টা—একটা বিশেষঅর্থে উহাকেও তাঁহারা ওই 'যোগ' আখ্যা দিয়া গিয়াছেন। এজন্য, ঈশ্বর লাভকল্পে, জ্ঞান-পথের এই সাধনার নামই তাঁহারা দিয়াছেন—জ্ঞানযোগ, আর কর্ম্মপথের এই সাধনার নাম দিয়াছেন—কর্ম্মযোগ ; আবার ঐরূপ ভক্তিপথের সাধনার নাম দিয়াছেন—ভক্তিযোগ।

আমরা কি বুঝিব ?

আমরা ইতিপূর্ব্বে 'কর্ম্মে'র যে ব্যাখ্যা দিয়াছি, তৎপর এইখানে (এই কর্ম্মযোগ কথাটীর উল্লেখের পর) আবার এই "জ্ঞানযোগ" ও "ভক্তি-

যোগ" দু'টী কথায় তোমরা হয়ত একটু গোলযোগে পড়িয়াছ। পড়িবারই কথা, কেননা, আমাদের পূর্ব্ব ব্যাখ্যানুযায়ী "জ্ঞান" ও "ভক্তি"—ইহারাও কর্ম্ম বটে। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তবে আবার উহাদের এখন এই সব স্বতন্ত্র নামাকরণ কেন? কথাটা ঠিক—উহারাও কর্ম্ম; কিন্তু ওখানে ওই 'কর্ম্মযোগ' কথাটীতে 'কর্ম্ম'শব্দটী একটু বিশেষ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। ভক্তি ও জ্ঞানমূলক নানাকর্ম্ম হইতে কতকগুলি ভিন্নমুখী বিশেষ কর্ম্মকে পৃথক ভাবে নির্দ্দেশ করার জন্যই ওই একটী স্বতন্ত্র সাধনপন্থাকে 'কর্ম্মযোগ' নাম দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কথাটা একটু জটিল, এবং আপাততঃ তোমাদের পক্ষে অনাবশ্যকীয়ও নিশ্চয়। অতএব এই অবান্তর কথাটা এইখানে ছাড়িয়া যাই। এ সম্পর্কে আমাদের শেষ ও আসল কথাটা এই যে, এই "নারীর কর্ম্মযোগ" গ্রন্থে ওই 'কর্ম্মযোগ' শব্দটা আমরা কতকটা একটা এইরূপ বিশেষ সাধনার অর্থেই ব্যবহার করিয়াছি।

নারী তাহার স্ব-গণ্ডীতে থাকিয়া গৃহস্থাশ্রমের দশকর্ম্মের মধ্যে কি ভাবে নিজকে পরিচালিত করিলে বিধাতার ঐ ইঙ্গিতানুযায়ী সুখ-শান্তি ও মঙ্গলের পথে নির্ব্বিবাদে অগ্রসর হইতে পারেন এবং এইভাবে নিজেকে ধন্য ও সেই বিশ্বস্রষ্টা সর্ব্বময়প্রভুর নিকটে যথাসাধ্য দায়মুক্তও করিতে পারেন—এ গ্রন্থে এ কথাটীই আলোচ্য।

গোড়ার বিচার

কিন্তু আজকাল এই 'নারীর সুখ' 'নারীর আদর্শ' ও 'স্ত্রী-জীবনের সার্থকতা' প্রভৃতি বিষয়গুলি লইয়া চারিদিকে যে ভাবে নাড়াচাড়া চলিতেছে, এইখানে—আমাদের মূলবক্তব্য লিপিবদ্ধ করার প্রারম্ভে—সে বিষয়েও একটু আলোচনা করিলে মন্দ হয় না। যেখানে রকম রকম কথা উঠিয়াছে সেখানে যুক্তিতর্কের আবশ্যকতাও অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে—এ

কথা অবশ্য স্বীকার্য্য। যুক্তিতর্কের কথাগুলি সাধারণতঃই জটিল, এজন্য যে উহারা সর্ব্বত্রই পাঠিকাঠাকুরাণীদের রুচিকর বা সহজবোধ্য হইবে—সে সম্ভাবনা কম। তাই, ইতিপূর্ব্বে আমরা একটু কষ্টসাধ্য হইলেও এই দরকারী আলোচনাগুলিতে একটু মনোনিবেশ করিবার জন্য তাঁহাদিগের নিকট আবেদন উপস্থিত করিয়াছি, কেননা—আমাদের মূল বক্তব্যগুলিতে শ্রদ্ধাভক্তি রাখিতে হইলে উহাদের পশ্চাতে যে যুক্তিতর্কের সমর্থক স্তম্ভগুলি রহিয়াছে উহাদের সঙ্গেও পরিচিত হওয়া বিধেয়।

দুই-তিনটী বিভিন্ন অধ্যায়ে, আমাদের জ্ঞান-বিশ্বাসানুযায়ীই যথাশক্তি আমরা এইসব বিষয়ের আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

গোড়ার দিকে যে-কথাটী লইয়া আজকাল প্রথমেই একটা পরম বিরোধ গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে উহা এই যে—নারীর কর্ম্মক্ষেত্র ও পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র এক কি স্বতন্ত্র ?

সরাসরি কোনো জবাব দিয়া হাল্কাভাবে এ কথাটাকে আমরা উড়াইয়া দিতে চাই না। এ বিষয়ের কোন কিছু শেষসিদ্ধান্তে পৌছিতে হইলে এসম্বন্ধে গুটি কতক আরও গুরুতর কথার মীমাংশা পূর্ব্বাহ্নে হওয়া আবশ্যক। সেগুলি এই—

(১) যে কর্ম্ম করিতে হইবে, কর্ম্মকর্ত্তার সে-কার্য্য করিবার যোগ্যতা থাকা চাই। এই যোগ্যতা পুরুষ ও নারীতে যে কোনো কর্ম্মক্ষেত্রে সমভাবে আছে কিনা ?

(২) যোগ্যতার কথা ছাড়িয়া দিলেও, কি পুরুষ, কি নারী—ইহাদের কাহারও এমন কোনও বিশেষ অসুবিধা কোনও দিকে আছে কিনা, যদ্দরুণ সেইদিকে উহাদের কাহাকেও কাজে লিপ্ত হইতে হইলে অপর পক্ষ হইতেও বেশী

ত্যাগ ও অযথাক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, বা কখনও কখনও বিপদাপন্ন ও পক্ষান্তরে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইতে হয়।

(৩) সকল কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী একত্রিতভাবে কাজ করিলেই জগতের অধিকতর উন্নতি, না পৃথকভাবে কাজ করিলে উহাতেই জগতের অধিকতর সার্থকতা?

আমরা প্রশ্ন কয়টী নিম্নে সমষ্টিভাবে যথাসাধ্য আলোচনা করিব।

নবীনের অভিযোগ

আজকাল নব্যদের মধ্যে অনেকেরই এই ভাব যে—কর্ম্মক্ষমতায় পুরুষ ও নারী কেহ কাহারও পশ্চাৎপদ নয়। তবে নারীকে যে পুরুষের অপেক্ষা অনেক ক্ষেত্রে পঙ্গু দেখা যায়, সে কেবল পুরুষদিগেরই স্বার্থপরতা ও নানা চক্রান্তের ফলে। একটা পাখীকে বহুকাল পিঞ্জরাবদ্ধ রাখিয়া তৎপর কোন দিন ছাড়িয়া দিলে সে যেমন তখন আর সহজে উড়িতে পারে না, পুরুষেরাও নারীদিগের অবস্থা দিনে দিনে কতকটা ঐরূপই করিয়া ফেলিয়াছেন। নানারূপ মিথ্যা শাস্ত্রবাণী শুনাইয়া ও স্বর্গ-নরকের প্রলোভন ও ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে তাঁহারা ক্রমে এমন একটা অসহায় অবস্থায় অভ্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন যে আজ তাহাদের ভাবাও শক্ত, কোনোদিকে তাহারা পুরুষদিগের সমকক্ষ। নব্যারা মুক্তকণ্ঠে আরও প্রচার করেন যে, স্বার্থপর পুরুষদিগের এই অসাধু চক্রান্তগুলি সেই মান্ধাতার আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত সমভাবেই জয়ডঙ্কা বাজাইয়া চলিয়া আসিতেছে।

তাঁহাদের এই কথাগুলিকে একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে শেষ পর্য্যন্ত এইরূপই দাঁড়াইবে :—

সমাজের আদি অবস্থায় আমাদের দেশে স্ত্রী-পুরুষ শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতায় প্রায় একরূপই ছিল। পরবর্ত্তী কোনও কালে (সে-ও খুব

সুদূর অতীতের কথা) সমাজের নেতৃস্থানীয় কূটনীতিকুশল একদল শাস্ত্রকারের ষড়যন্ত্রে ও মিথ্যাপ্রচারের ফলেই ভ্রান্ত হইয়া নারীরা ক্রমে অধঃপতিত হইতে সুরু করে। সমাজের বড় বড় নেতাদের মধ্যে তখন এমন একজনও সাধু বা বুদ্ধিমান পুরুষ ছিলেন না, যিনি এই মিথ্যাপ্রচারের মিথ্যাটুকু ধরিয়া দিতে পারিতেন, বা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সাহসী হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগের মত সেকালে এমন স্পষ্ট বক্তা ও নিঃস্বার্থ পুরুষ উঁহাদের মধ্যে একজনও ছিলেন না। এমন কি, উহার পর শতাব্দী শতাব্দী ধরিয়াও এই ভাবটীই চলিয়া আসিয়াছে। আর সেকালে মেয়েরাও বড় আশ্চর্য্যরকমের বোকা ছিল। গোড়ার দিকে (অর্থাৎ এই ষড়যন্ত্রের আদিকালে) যখন শক্তিসামর্থ্যে বা সুযোগ-সুবিধায় কোনোদিকেই উঁহারা পুরুষজাতির ন্যূন ছিলেন না তখনও যে কেন বুদ্ধিবলে এ ষড়যন্ত্রটা তাঁহারা ধরিতে পারেন নাই, বা ধরিয়া উহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নাই, ঠিক বোঝা যায় না। অরুন্ধতী, সাবিত্রী (শাস্ত্রজ্ঞানে যিনি নারদকেও বিস্মিত করিয়াছিলেন), গান্ধারী, কুন্তী বা দ্রৌপদী প্রভৃতি মহিয়সী ললনাদের কথা তুলিয়া ফল নাই, কেননা, উঁহারা সত্যকার মানব ছিলেন, কি নিছক কবির কল্পনা, কে বলিবে? কিন্তু মৈত্রী, গার্গী, মদালসা, খনা, লীলাবতী, ভারতী (যাঁহাকে তাঁহার পণ্ডিতস্বামী মণ্ডনশ্রীর সহিত তর্কযুদ্ধকালে স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যও বিচারক সাব্যস্ত করিয়াছিলেন), লক্ষ্মীবাই, অহল্যাবাই ও রাণী ভবানীর মত রমণীরা যদিও খুব তেজস্বিনী, বুদ্ধিমতী ও ক্ষমতা-শালিনী ছিলেন, ঐ ষড়যন্ত্রের ক্রমিক নিষ্পেষণের ফলে এবং যুগযুগান্তের সংস্কারবশেই উঁহারাও নিশ্চিত উপায়হীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরন্তু যদিও তাঁহারা পক্ষান্তরে এত উন্নত হইয়াছিলেন, কিন্তু একালের নারীদের মত এমন স্পষ্ট ভাষায় মুক্তকণ্ঠে এত বড় অত্যাচারের কথাটা ভাঙ্গিয়া বলিতে পারিতেন—এমন সৎসাহস উঁহাদের কাহারও ছিল না!

অভিযোগের ভিত্তি কৈ ?

নব্যদের এহেন চিত্রের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণভাবে সায় দেওয়া সুকঠিন। আমরা বলিতে বাধ্য যে, নারীর যোগ্যতা সর্ব্বত্র পুরুষের অনুরূপ হইলে, পুরুষের এ ষড়যন্ত্রটা গোড়াগুড়িই তাঁহারা নিশ্চয়ই ধরিয়া ফেলিতে পারিতেন এবং পণ্ড করিয়াও দিতে পারিতেন। যদি বলা যায়, এ ষড়যন্ত্রটা এতদিন যে তাঁহারা বোঝেন নাই বা এতকালে বোঝেন নাই—ওটা তাঁহাদের বোকামি, তবে তার উত্তর—ঐ বোকামিটাই তো তা'হলে তা'দের একটা মস্তবড় অযোগ্যতা ; অন্ততঃ বুদ্ধির ক্ষেত্রে নারী পুরুষ হইতে পঙ্গু। আর যদি বলা যায়, নারী যে কথাটা না বুঝিতে পারিয়াছে তাহা নয়, কিন্তু বুঝিতে পারিয়াও পুরুষের সঙ্গে সে আঁটিয়া উঠিতে পারে না তো!—তবে তার জবাব—তা'হলে, ঐ মানসিকই বলো আর দৈহিকই বলো, এমন কোনও দুর্ব্বলতা বা অক্ষমতা নিশ্চয় তাঁহার মধ্যে আছে, যা'র ফলে বাধ্য হইয়াই পুরুষের নিকটে এ-পরাভব তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হয়।

আমাদের প্রত্যুত্তর

কিন্তু আমরা বলি কি, আসল বিষয়টী—এই দু'জাতীর ব্যাখ্যা হইতেই একটু স্বতন্ত্র। নিছক পুরুষের চক্রান্ত মূলেই নারী যে আজ পুরুষ অপেক্ষা এত হীন ও অসহায় হইয়া পড়িয়াছেন, এটা একটা আষাঢ়ে গল্প বই আর কিছুই নয়! বস্তুতঃ নারী পুরুষ অপেক্ষা হীনাও নয় আর দীনাও নয়। প্রকৃত কথা এই যে, কোনও কোনও দিকে পুরুষ যেমন নারী অপেক্ষা প্রবল, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নারীও পুরুষ হইতে অনেক গুণে প্রবলা ও শ্রেষ্ঠা। সুতরাং যোগ্যতা বিষয়ে নারীপুরুষের অসমত্বটা কেবল মাত্র ক্ষেত্রবিশেষেই লক্ষিত হইয়া থাকে। আমাদের আরও মনে হয়, বস্তুত নারী নিজেও এ কথাটা

চিরকালই বুঝিয়া আসিয়াছে, এবং বুঝিয়া আসিয়াছে বলিয়াই, সমাজের ভিতর তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানটীকে সে কথনও নিজে তত হেয় বা অসম্মানকর মনে করে নাই, এবং একারণে এ অবস্থার বিরুদ্ধে কথনও সে প্রতিবাদও করে নাই। প্রতিবাদের সত্য কোনও কারণ থাকিলে, সে-প্রতিবাদ নিশ্চয়ই সে করিত, এবং এই প্রতিবাদের পরে প্রতিকার করিবার মত শক্তি, সামর্থ্য ও যোগ্যতাও সে কোনও দিকে না কোনও দিকে প্রয়োগ করিতে অবশ্যই সমর্থ হইত।

তবে কি আজকাল নব্য সম্প্রদায়েরা নারীর এত সব অসহায় ভাবের বিরুদ্ধে যে নানা কথা তুলিয়া এত চেঁচামেচি সুরু করিয়াছে—এসকলই ভুল? নারীর সত্যকার কোনও অভিযোগই আজ নাই? উত্তর—না, সেকথাও আমরা মনে করি না। তাঁহাদের অভিযোগের কারণ হয়ত আজ কিছু সত্যসত্যই আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তার জন্যে আমরা তো মনে করি, এই আধুনিক যুগটা, এবং এই যুগের আমরা পুরুষ নেতাগণই হয়তবা প্রকৃতপক্ষে অনেকাংশে দায়ী।

কথাটা আপাতঃদৃষ্টিতে অনেকখানিই বিসদৃশ মনে হইতে পারে বটে, কেননা—দেখিতে পাওয়া যায়, এই আধুনিক যুগের পুরুষদিগের মুখ হইতেই এই নারী-আন্দোলনের প্রচারটা এমন গভীরভাবে প্রসারিত হইতে সুরু করিয়াছে। কিন্তু এই আধুনিক পুরুষেরা পতাকা বহন করিয়া এ আন্দোলনটা প্রচার করিতে এমনভাবে ব্রতী হইয়াছেন বলিয়াই ইহার যাবতীয় গূঢ়রহস্যবিষয়েও তাঁহারদের সকলেই যে সুপরিজ্ঞাত ও ভ্রম প্রমাদশূন্য, এমত বলা অযৌক্তিক।

বিরোধ কোথায়?

যাহা হউক, এসম্বন্ধে আমাদের নিজের বক্তব্যটা এইক্ষণ আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলা দরকার। আমাদের নারী-সমাজের বর্ত্তমান দুর্গতির নিমিত্ত

অনেকে প্রাচীন শাস্ত্রকার ও প্রাচীন সমাজের পুরুষ নেতাগণকেই দায়ী করেন বটে, কিন্তু কিভাবে সত্য সত্য যে উঁহারা উহার জন্য দায়ী হইলেন, সে-কথাটা তাঁহারা নিজেরাও যেমন ভাল করিয়া বুঝিতে চাহেন না, অপরকেও ভাল যুক্তি-তর্ক দিয়া প্রবোধ দিতে চান না। আমাদের বর্ত্তমান নারী-সমাজের দুর্গতির আকারটা সত্যসত্য কি, এবং উহা কিভাবে, কথন, কোথা দিয়াই বা আসিল, সে-সম্বন্ধে আমাদের সকলের স্পষ্ট ধারণা আছে, এমনও মনে হয় না। নারীর দুর্গতির কোনও সুস্পষ্ট ধারণা আয়ত্ত করিবার জন্য, পূর্ব্বাহ্নে নারীর আদর্শ সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ও স্থির ধারণা থাকা আবশ্যক। এই আদর্শটার সন্ধান পাওয়া গেলে নারী আজ এই আদর্শ হইতে সত্যসত্য কতটা সরিয়া পড়িয়াছে, উহাও আয়ত্ত করা সম্ভবপর হইয়া উঠিবে।

পরিচ্ছেদান্তরে এই 'নারীর আদর্শ'টী সম্বন্ধে যথাসাধ্য আমরা আলোচনা করিয়াছি। সে-সম্বন্ধে নানা বিস্তারিত যুক্তিতর্কের কথা ছাড়িয়া দিয়া এইখানে বোধহয় এইটুকু মাত্র উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যতদূর বোঝা যায়, নিম্নলিখিত কয়েকটী ধারণা হইতেই আমাদের নারী-সমাজকে আপাততঃ আমরা এত পঙ্গু ও অসহায় মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

(ক) আমাদের মেয়েদের কর্ম্মক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করিবার কোন অধিকারই নাই। তাঁহাদের সুখ-দুঃখ ও ভাল-মন্দ সকলই পুরুষদিগের হাত-ধরা। এক কথায় সমাজে পুরুষদিগের তাঁহারা দাসী-বাঁদী। পুরুষদিগের কৃপাদৃষ্টি না পাইলে, নিজ চেষ্টা-উদ্যোগে আত্মরক্ষা করিয়া থাকিবার মত উপায়ও তাঁহাদের নাই। স্বেচ্ছাচারী পুরুষের খেয়ালের

অত্যাচারে এইজন্যই দিনে দিনে তাঁহাদের স্বাস্থ্য, শক্তি ও সম্ভ্রম ক্রমে অন্তঃর্হিত হইতেছে।

(খ) এইজন্যই নারীরা নিজের বা সমাজের বা দেশের—কাহারই কোনো ভাল কাজে লাগিতেছে না! দেশের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও সমাজের অর্দ্ধেক শক্তি-সামর্থ্য এইভাবেই পণ্ড হইয়া যাইতেছে।

(গ) নারীরা বাহিরে বাহির হইয়া পুরুষদের মত সকল কাজে আত্মনিয়োগ করিতে ও যথেচ্ছা অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিলে প্রত্যেক পরিবারের, এমন কি সমগ্রদেশের অর্থসমস্যা বহুল পরিমাণে দূরীভূত হইত।

(ঘ) অবরোধ-প্রথা, পর্দ্দা ও পুরুষদিগের সঙ্গে স্বাধীনভাবে মেলামেশার বাধাবিঘ্নগুলি না থাকিলে দেশের উপকারার্থে তাঁহারাও আজ অনেক কাজ করিতে পারিত, এবং জ্ঞান-বিস্তারের দিক দিয়াও তাঁহাদের অনেক সুবিধা হইত।

একটু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে বোঝা যাইবে, বর্ণিত উপরোক্ত অসুবিধাগুলির দরুণ সমাজে যে-সকল অমঙ্গলের কারণ সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়, বিশেষ করিয়া উহারা দুইভাগে বিভক্ত:— (১) নারী নিজে বড় অসহায় হইয়া পড়িয়াছে, এবং (২) দেশের ও সমাজের কাজে নানাদিক দিয়া নানা বিপদ-আপদ ও অসুবিধা আসিয়া দেখা দিয়াছে।

সব কথা খাঁটি নহে—স্বাধীন কেউ নয়। শাসনের প্রয়োজনীয়তা।

এইসব কথার পৃষ্ঠে আমাদের বক্তব্য এই যে, নারীর এই সব অসহায় ভাব ও উহার কারণগুলির চিত্র খুব খাঁটি নহে। আমাদের বর্ত্তমান

অবস্থায়ও নারীরা সত্যসত্য পুরুষদের এত হাতধরা নয় বা এত নিরাশ্রয়ও নয়। অধিকাংশস্থলেই তাঁহাদের নিজেদের অনেক দুর্ব্বলতা ও দোষ-বশতঃই এইসব অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে। নারীকে আমাদের সমাজে পুরুষেরা সত্যসত্য দাসীভাবে দেখেন বলিয়া তো মনে হয় না; তবে তাঁহাদিগেরই মঙ্গলামঙ্গলের দিকে লক্ষ্য করিয়া অনেকটা শাসনের গণ্ডীর মধ্যে রাখিতে চান বটে। মঙ্গলকর শাসন সকলের পক্ষেই হিতকর। এই শাসনের বাঁধন এড়াইয়া কাহারই চলে না, নারীরও না, পুরুষেরও নয়। যেদিকে চাও, সকলকেই কিছু না কিছু শাসনের গণ্ডীতে থাকিতেই হয়। পুরুষও সমাজিক ও রাষ্ট্রীক নিয়মের অধীন, এমন কি, বহুস্থলে নারীর শাসনেরও অধীন বটে। নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতা কাহারও নাই, এই বিরাট প্রকৃতিও কতকগুলি আইনকানুনের বশীভূত হইয়াই প্রতি-নিয়ত চলিতেছে এবং যতদূর দেখিতে পাই, স্বয়ং ভগবানও তাঁহার নিজেরই নির্দ্দিষ্ট বিধিবিধান যতক্ষণ সম্ভব পালন করিয়াই চলেন। জগতে আসিয়া প্রতিকার্য্যে, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, কিছু-না-কিছু বাহিরের বাধাবিঘ্নে আত্মসমর্পণ করিতেই হয়। নিজেদের সুখ-শান্তি ও মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য করিয়াই এইসব সহিতে হয়, এবং উহা বুঝিয়া সকলে সে-সব সহেও।

ঘরের শাসন ও বাহিরের শাসন—কোনটা শ্লাঘ্য?

নারী যদি ঠিক পুরুষদের মতই চলিতে ফিরিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলেই বা কিরূপে বাহিরের বাধাবিঘ্নগুলিকে সে একেবারে ঠেকাইয়া চলিবে? ঘরের অভিভাবকের অধিকার হইতে বাহির হইয়া নারী বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করিলে এইটুকুই মাত্র অবস্থান্তর ঘটিবে যে, আপনার লোকের পরিবর্ত্তে বাহিরে অপরলোকের নিকটে তাহাকে

'দাসখত' দিতে হইবে। ঘরের অভিভাবকের আদেশ-অনুজ্ঞার পরিবর্ত্তে বাহিরের মুনীবের আদেশ-অনুজ্ঞা শুনিয়া চলিতে হইবে।

এ অবস্থাটা শ্লাঘ্য কি দুর্ভাগ্যের—ভাবিবার বিষয়। ঘরের অভিভাবক হইতে বাহিরের মুনীব কোন্‌দিক্ দিয়া শ্রেষ্ঠ? ঘরের অভিভাবকের আদেশ-অনুজ্ঞাগুলির মধ্যে কিছু-না-কিছু মেয়েদের মঙ্গলামঙ্গলের দিকেও লক্ষ্য থাকে নিশ্চয়, কিন্তু বাহিরের মুনীবের লক্ষ্য তাঁহার নিজের স্বার্থের গণ্ডী ছাড়িয়া অপর কোনও দিকে যাইতে পারে, একথা কেহ বিশ্বাস করিবেন কি? তবে এখানে একটা বলিবার কথা এই আছে যে, বাহিরের ক্ষেত্রে সুবিধা-অসুবিধা বুঝিয়া নারী মুনীব পরিবর্ত্তন করিতে পারেন, কিন্তু অন্তঃপুরের ভিতরে সে সুবিধা নাই। সেখানে পুরুষ চিরকালের মতই তার প্রভু, এবং এই চিরস্থায়ী প্রভুত্বের সুযোগ-সুবিধা পাইয়া সে তাহার উপর যতখানি অত্যাচার করিবার অবকাশ পায়, বাহিরের কোনও মুনীবের পক্ষে ততখানি সম্ভবপর নহে। কিন্তু যে-কোনো হিন্দুপরিবারে পুরুষ ও রমণীর স্বার্থ ও মঙ্গলামঙ্গল পরস্পরের কার্য্যের সহিত এমন নিবিড় ও অচ্ছেদ্যভাবে সম্বদ্ধ যে, পুরুষের পক্ষে তথায় এহেন স্বেচ্ছাচার-প্রদর্শন প্রায়শঃই সম্ভবপর হয় না। ভুল-ভ্রান্তি বা অশিক্ষাবশতঃ কুত্রাপি কোথায়ও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলেও, বলা যায়, নারীর পক্ষে তথায় প্রতিকারের উপায় বাহিরে যাওয়া নহে, পরন্তু এই অশিক্ষার অন্ধকারকে পরিবার হইতে সর্ব্বপ্রযত্নে দূর করা।

কিন্তু বাহিরের শাসন ভাল, কি ভিতরের শাসন ভাল—সেটা এক ধাপ পরের কথা। আমরা প্রথমত; একথাটাই বলিয়া লইতে চাই যে, সর্ব্ব প্রকার শাসনের গণ্ডী ছাড়াইয়া নিরবচ্ছিন্নরূপে স্বাধীন হওয়া, কি নারী কি পুরুষ, কাহারও পক্ষেই সম্ভবপরও নয়, আর মঙ্গলজনকও নয়। সুতরাং জগতের অপর সকলের মত নারীকেও শাসনের বাঁধন মানিতেই হইবে। এখন দেখা যাক্, অন্তঃপুরের ভিতরে এই শাসনের গণ্ডীতে

থাকিয়াও নারী সত্য সত্য এত অসহায় ও পঙ্গু কিনা এবং এই অন্তঃপুরে থাকার দরুণ সমাজের বা দেশের বা নারীর নিজের কোথায় কি অসুবিধা ও ক্ষতি জন্মিতেছে।

গৃহধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা

এসব কথার উত্তরে আমাদের প্রথম বক্তব্য এই যে, দেশ ও সমাজ যেমন দুইদিকের দুইটী বড় কথা, আমাদের এই গৃহ-সংসারের কথাটীও তদ্রূপ। এই গৃহ-সংসারকে সুখের করিবার জন্যই সমাজকে ও দেশকে উহার অনুকূল করিয়া গঠন করিতে হয়। গোড়াতে এই গৃহের সুখ-শান্তির মূলেই কুঠারাঘাত করিলে ওই সমাজ বা দেশের ভালমন্দটাও বহুলাংশে অর্থশূন্যই হইয়া পড়িবে। আর এই গৃহের শান্তি না থাকিলে সমাজ বা দেশের সাধনাও দুঃস্বপ্ন মাত্র। অবশ্য এই গৃহের শান্তিকেই পাকাভাবে স্থায়ী করিবার জন্য পূর্ব্বাহ্নে এমন কতকগুলি সমাজের ও দেশের কাজের ডাক আসিয়া পড়িতে পারে যে তখন আপাতঃভাবে এই গৃহের সুখ-শান্তিকেও কিছুটা আমাদের উপেক্ষা করিয়া চলিতে হয়। উহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কাল যদি দশটাকা পাইবার সম্ভাবনা থাকে তো আজ গাঁট হইতে দুই টাকা বাহির করিয়া দেওয়া অবশ্যই বিচক্ষণতার কার্য্য। কিন্তু যদি এমন কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় যে, এই দশটাকার প্রলোভন মূলেই আবার অপর কোনও দিক্ দিয়া দেউলিয়া বনিবার কারণ আসিয়া পড়িতেছে, তবে সে দশ টাকা লাভের প্রত্যাশা ছাড়িয়াও, তখন সে দু'টাকা আমার না ব[illegible] করিয়া দেওয়াই সঙ্গত। সুতরাং দেশের কাজের বা সমাজের [illegible]জের ডাক আসিলেও, গৃহের সুখ-শান্তির ত্যাগটা ততটুকুই আমরা স্বীকার করিতে পারি, যতটুকুর দরুণ পাকাভাবে আমাদের গৃহের মঙ্গল ও সুখ-সৌভাগ্য একেবারে বিনষ্ট না হইয়া যায়।

নানা গৃহ-বন্ধনের অত্যাবশ্যকতা

আমাদের মনে হয়, আমাদের গৃহের বন্ধনের মধ্যে এমন কতক-গুলি বন্ধন আছে যাহারা একবার ছাড়া পাইলে আর সহজে হাতে ফিরিয়া আসিবে, সে সম্ভাবনা নাই; অন্ততঃ সহজে যে আসিবে না, সেকথা স্থির। বিগত দেড় হাজার দুই হাজার বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশে কত রাজত্ব ডুবিয়া গেল, আবার কত রাজত্ব নূতন গড়িয়া উঠিল; কত সমাজ নষ্ট হইল, আবার কত নূতন সমাজের সৃষ্টি হইল, কিন্তু আমাদের পারিবারিক নীতি ও বিধানগুলি এতকালের মধ্যেও তেমন বিশেষ বদলায় নাই। সকল ছাড়িয়াও এই জিনিষটীকে সর্ব্বস্বপণ করিয়া আজও আমরা আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছি। বোধ হয় এই চেষ্টার পশ্চাতেও ওই ভয়—এ জিনিষ একবার হাতছাড়া হইলে আর হয়ত সহজে ফিরিয়া আসিবে না। কিন্তু এ জিনিষগুলির জন্যে এ ভয়ে এত কাতর আমরা কেন হই—এইটাই প্রশ্ন। জিনিষগুলি কালে কালে যদি নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়া নিতান্তই অপরিহার্য্য ও কল্যাণকর বিবেচিত না হইয়া আসিত, তবে ও-ভয় আসিত কি? বলা যায়—কখনই নয়।

গৃহকর্ম্মে নারী ও পুরুষের ভাগ

আমাদের এই জাতীয় পারিবারিক বন্ধনগুলির মধ্যে মোটামুটিভাবে এই কয়েকটীকে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে:—পুরুষ বাহিরের আপদ-বিপদ হইতে পরিবারকে রক্ষা করিবেন, এবং উহার ভরণপোষণের জন্য দায়ী হইবেন; রমণীরা গৃহের সকল প্রধান প্রধান কাজকর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন, শিশু প্রতিপালন করিবেন এবং রন্ধন ও সেবাশুশ্রূষাদির দ্বারা পরিজনের পরিচর্য্যা করিবেন। ব্রতপূজাদি লৌকিক ধর্ম্মকর্ম্মের ব্যাপারেও রমণীরাই অধিকতর অগ্রসর হইয়া সকল আয়োজন-উদ্যোগ করিবেন।

পৃথকত্বের আবশ্যকতা

সংসারের খরচ, রন্ধনাদি গৃহস্থালীর যাবতীয় নিত্য কাজ, শিশুপ্রতিপালন, পরিজনের সেবাশুশ্রূষা, লৌকিক ধর্ম্মাচার—বস্তুতঃ সর্ব্বগৃহে ইহাদের প্রয়োজনীয়তাই অপরিসীম। কোন গৃহের পক্ষেই ইহাদের একটীও উপেক্ষনীয় বা পরিহার্য্য নয়। নিত্যই ইহাদের প্রয়োজন এবং যে পরিবারে যত অধিক পরিমাণে ইহাদের সুব্যবস্থা, সে পরিবারে সুখশান্তির পরিমাণও তত অধিক। এই কাজগুলিকে হিন্দু-সমাজরক্ষকগণ ঐ ভাবে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এতকাল বিভাগ করিয়া দিয়া যে সুবিবেচনার কার্য্যই করিয়া আসিয়াছেন—ইহা অস্বীকার করা যায় না। এ কার্য্যগুলি অন্যান্যদেশে ও অন্যান্য সমাজে আজও পর্য্যন্ত অল্পাধিক ঐভাবেই স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিভক্ত দেখা যায়। সন্তান-রক্ষা, শিশু-প্রতিপালন, গৃহ-সংরক্ষণ—এগুলি, সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়, নারীদেরই বিশেষ কাজ, এবং উহাদের দ্বারাই শ্রেষ্ঠতরভাবে নিষ্পন্ন হইতে পারে। তবে একথা সত্য যে, আমাদের সমাজে এগুলির মধ্যেই নারীদিগকে যেভাবে আমরা একনিষ্ঠভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছি, সেরূপ অন্যত্র কুত্রাপি আর দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ইহারও কারণ আছে বলিতে হইবে। প্রথমতঃ, এ কাজগুলি এত গুরুতর যে, যাহাদের উপর উহাদের ভার প্রদত্ত হয়, যদি একনিষ্ঠভাবে উহাদের মধ্যেই নিবদ্ধ না থাকিয়া উহারা অন্যদশদিকে নজর দিতে যান, তাহাতে মোটের ওপর শেষপর্য্যন্ত পরিবারের লোকসানই হইবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের দেশের ও সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলিও এই ব্যবস্থারই অনুকূল। নারীকে এ গণ্ডীর বাহিরে অন্য নিযোজিত করিতে গেলে, অনেক দিক হইতেই অশেষবিশেষ অপ্রীতিকর জাতীয় এমন সব বিপদ-আপদ আসিয়া আমাদিগকে বিব্রত ও বিপদগ্রস্ত করে যে উহাতেও শেষ পর্য্যন্ত আমাদের পারিবারিক সুখ-শান্তির অধিকতর অনিষ্টই সাধিত হইয়া থাকে।

এইক্ষণ, এই ব্যবস্থার দ্বারা নারীর ওপর কোনও সত্যকার অবিচার বা অত্যাচার করা হইল কিনা, সে বিবেচনা করা যাক্।

কাহার ভাগ গুরু? নারীর দাবী।

নারীর ওপর অর্পিত এই কর্ম্মগুলির ভার বস্তুতঃই যদি এত গুরুতর হয় যে, পুরুষদের চাইতেও অনেক বেশী তাহাদিগকে খাটিতে ও সংসারের ভার বহন করিতে হয় বলিয়া মনে করা যায়, তবে ইহাও অবশ্য কর্ত্তব্য যে নারীর এই অতিরিক্ত দায়ীত্বের ভার লাঘবকল্পে পুরুষগণও আংশিক ভাবে যথাসম্ভব উহা গ্রহণ করিবে; কিন্তু তেমন অবস্থায় এ কথাও স্বীকার্য্য যে, নারী আর তখন বাহিরে ছুটিবার উজুহাতও কিছুমাত্র খুঁজিয়া পাইবেন না।

কিন্তু পক্ষান্তরে নারী যদি বলে, তাহার এ ভারটুকু পর্য্যাপ্ত নয়, ইহারও অনেক বেশী আরও কিছু সে করিতে পারে, এবং কেনই বা সে-সব করিয়া যথসম্ভব সে তাহার নিজের, সমাজের ও দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ না করিবে, এবং যদি সে-অভিযোগও সত্যই হয়, তবে বলিতে পারা যায়, তাহাকে এইরূপে পঙ্গু করিয়া রাখা পুরুষের পক্ষে মাত্র দুইটি কারণেই সম্ভব ও ন্যায্য; এবং সেই দুইটী কারণ হইতেছে এই যে (১)—যদি সত্য সত্যই পারিবারিক শান্তির মূলভিত্তি চিরকালের মতই এই অবস্থান্তর বশতঃ ধসিয়া পরিবার কারণ হয়, (২) এবং তদ্দারা অপর কোনও দিক হইতে এমন কোনও নূতন আপদ-বিপদ আসিবার সম্ভাবনা থাকে যদ্দারা আমাদের ঈপ্সিত সুফলের ওপরেও বিপদাপদের মাত্রা ভারী হইয়াই উঠে। অর্থাৎ যে সার্থকতার জন্য নারীকে বাহিরে যাওয়া, যদি এই বাহিরে যাওয়ার ফলে আবার অপর দিকে এমন বিপদাপদেরই উদ্ভব হয় যে, উহারদ্বারা মোটের ওপর অমঙ্গলই বেশী হয়, ঈপ্সিত সুফলের সার্থকতায়ও সে অনিষ্টের ক্ষতিপূরণ হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তবে সেক্ষেত্রেও নারীকে পুরুষের বাধা দেওয়াই সঙ্গত।

এইভাবে বাধা দেওয়ার নিমিত্ত পুরুষকে স্বার্থপর বা স্বেচ্ছাচারী বলিলে ঠিক হইবে না। যে মঙ্গলামঙ্গলের উপর লক্ষ্য রাখিয়া পুরুষ এই কার্য্য করিবেন, সে মঙ্গলামঙ্গল নারী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই তুল্যভোগ্য। কিন্তু যেস্থলে উপরোক্ত দুইটী কারণের কোনটীকেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এবং তবু সে বাঁধা দেয়, নারী সেস্থলে নিশ্চিত নিগৃহীত ও অত্যাচারিত হইয়া থাকে।

যদিচ আমরা আজকাল কতকাংশে এইরূপে নারীকে নিগৃহীত ও অত্যাচারিত করিতেছি, তথাপি চিরকালই যে এইরূপ করিয়া আসিয়াছি, একথা অমূলক। নারীকে নির্ব্বিবাদে ও যথেষ্ট সুফলের সম্ভাবনা লইয়া বাহিরে নিয়োজিত করিবার সুযোগ-সুবিধা সত্যসত্যই বহুকাল আমাদের হয় নাই। হয়ত বা এই বাহিরে পাঠাইবার আবশ্যকতাও এতকাল আমাদের হয় নাই। এ সুযোগ-সুবিধা আজও পুরোপূরিভাবে আসিয়াছে কিনা, এবং এ আবশ্যকতাও খুব অধিক পরিমাণে আজ আমরা অনুভব করিতেছি কিনা—এসবও মতান্তরের বিষয়। তবে, বর্ত্তমানে, কালধর্ম্মে ও চলিত একটা বিশেষ অবস্থায় সে সুযোগ-সুবিধা ও আবশ্যকতা কতক পরিমাণে আসিয়াছে, এপর্য্যন্ত স্বীকার করা যায় বটে।

পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের উপার্জ্জনের ওপর সংসার নির্ভর করিত না, কিন্তু আজ সে অবস্থার অবশ্যই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অতীতকালে পুরুষ, কি দৈহিক শক্তিতে, কি অর্থবলে পরিবার রক্ষায় অক্ষমতা প্রকাশ করে নাই, কিন্তু সে-গর্ব্ব পুরুষের আজ আর নাই। পুরুষ আজ সত্যসত্যই নারীর এই দ্বিবিধ সাহায্যেরই প্রত্যাশী, তাহার একার উপার্জ্জনে সংসার আর চলিয়া উঠে না, নারীর সাহায্য ব্যতীত আজ সে স্বরাজলাভেও অক্ষম। তারপর, ইতিমধ্যে দেশের হাব-ভাবেও কিয়ৎপরিমাণে এমত পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে যে, বহির্গমনজনিত নারীর আপদ-বিপদও কিয়ৎ-

পরিমাণে অনেকটা দূরীভূত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে হয়ত বা তাহার মানসম্ভ্রমের মাপকাঠিটাও আবশ্যকানুরূপ অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়াও আসিয়াছে।

সুতরাং নারী আজ একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে এই বাহিরে যাইবার দাবী অনেকটা গর্ব্ব ও জোরের সহিতই পুরুষের নিকট উত্থাপিত করিতে পারে। বলিতে পারে—"তোমরা যখন রীতিমত উপার্জ্জনে অক্ষম, দেশের কাজ একা সাম্‌লাইতে পার না, আমাদের নানা সামাজিক অভাব-অভিযোগের দিকেও এত অন্ধ, তখন আমরাও এখন বাহিরে যাইব না তো কি? এজন্যই বলিতেছিলাম, নারীর এই অসহায় ভাবের দরুণ আধুনিকেরাই প্রধানতঃ দায়ী। প্রাচীনকালে পুরুষদের বিপক্ষে নারীর এ জাতীয় অভিযোগের অবকাশ ছিল না। আধুনিকেরা যে কেবল মাত্র ভাগ্যবশেই এসব অভিযোগ আজ মাথা পাতিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন, ঠিক তাহাও নহে। বলিতে পারা যায়, বহুলপরিমাণে তাহাদের এই নিজের অক্ষমতাগুলি তাহাদের নিজেরই হাতে গড়া।

নবীনের অক্ষমতা

আজ আমরা ঘরে বাহিরে 'বাবু' হইয়াছি, শুধু নিজেরা বিলাসিতায় পড়িয়াই যে তেজ, বীর্য্য ও অর্থের হানি করিতেছি, তাহা নয়, স্ত্রী-কন্যা পরিবারবর্গকেও যথাশক্তি সেই স্রোতেই ভাসাইয়া দিয়াছি। খাইতে-পরিতে না পারি, কিন্তু ফ্যাসন-সই জামাজুতা চাই, দু'আনা চার-আনা চুলছাটাই চাই, গৃহিনীর জন্য "হিমানী" এসেন্স, সাবান ও বেনারসী শাড়ী চাই। 'ঠেকা বড় বালাই'—স্বাস্থ্য হারাইয়া, গোলামি স্বীকার করিয়া ও কেরাণীগিরি লইয়াও এইসব আরাম আমাদিগকে বজায় রাখিতেই হইবে। সংসাররক্ষার মত অর্থ এবং দেশের ও সমাজের কাজ করিবার মত নৈতিক বা দৈহিক বল বা তেজবীর্য্য আসিবে কোথা হইতে?

তারপর নারী এই নয় সেই নয়—এসব যথেষ্ট বলিতেছি বটে, কিন্তু আমাদের নিজের কুসংস্কার, কাপুরুষতা, পরস্পরের প্রতি সঙ্কীর্ণ নীতি, স্বাস্থ্যের ও সদ্‌শিক্ষারপ্রতি অমনোযোগিতা—এইগুলির প্রতি কতখানি আমরা দৃষ্টি দেই ? মুখে যেটুকু বলি, কাজে সেটুকুই বা কতটা করিয়া থাকি ? মেয়েকে বয়স্কা না করিয়া বিবাহ দিতে নাই, ছেলেকে যোগ্য না করিয়া বিবাহ দেওয়া ভুল, পণপ্রথা দূষণীয়, স্বদেশী কাপড় অবশ্য পরা কর্ত্তব্য,—এশ্রেণীর কত ভাল কথাই না অহরহ আমরা বলিয়া থাকি,—কিন্তু কার্য্যতঃ ইহারা রক্ষিত হয় কতটুকু ? এখন জিজ্ঞাস্য—তবে আমাদের এ অক্ষমতার জন্য দায়ী কে ?

একটা ভুল সংস্কার। হিন্দু-সমাজে নারী ক্রীতদাসী নয়।

যাক্—আমাদের অক্ষমতাই হউক, আর যে-জন্যেই হউক, নারী যে আমাদের সমাজে আজ অনেকটা পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে—একথা ঠিক। তার সে শিক্ষা-দীক্ষা, স্বাস্থ্য, মানসিক বল, সৎসাহস—আজ আর নাই। কিন্তু এজন্য, সমাজে তার কোনও প্রকার স্বাধীনতা নাই বা সে পুরুষের দাসী—একথাই বা কে বলে। সে উপার্জ্জন করিয়া আনে না বলিয়া কোনও পুরুষ কখনও তাহাকে ঝি-চাকরাণীর চক্ষে দেখিয়াছেন বা দেখেন—এমন তো মনে হয় না। এমন কি, একটা নার্স বা একটা স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর মান-সম্ভ্রম তাঁহার উপরওয়ালীর নিকট যতটুক্, স্বামী, পুত্র বা প্রতিপালক শ্বশুর-ভাসুরের নিকট সর্ব্বত্র নিশ্চয়ই তদপেক্ষাও অনেক গুণে অধিকও সুপ্রতিষ্ঠিত। সংসারের যে-অংশের ভার তা[illegible]র উপর অর্পিত সে-অংশে নারী বস্তুতঃই কর্ত্রী, পুরুষের ইঙ্গিত বা আদেশ মানিয়া সেখানে তাহাকে প্রায় চলিতে হয় না, বরং পুরুষই সেইখানে নারীর অনুগামী হইয়া চলিতে বাধ্য হয় ও চলে—ইহাইতো দেখি। অবশ্য অনুদার, দুর্জ্জন ব্যক্তি

পুরুষ ও নারী এই উভয় সম্প্রদায়েরই মধ্যে মাঝে মাঝে যে দৃষ্ট হয় না, এরূপ নহে, কিন্তু ক্বচিৎ কদাচিৎদৃষ্ট এসব তুচ্ছ ব্যতিক্রমের কথা না ধরাই কর্ত্তব্য। এমত ব্যতিক্রম কোন্‌ক্ষেত্রে নাই ?

আমরা বলিয়াছি, স্ত্রীপুরুষ সকলকেই শাসন মানিয়া চলিতে হয়। কিন্তু এতদ্‌সত্বেও সকল কাজেই প্রত্যেকেরই কিছু-না-কিছু স্বাধীনতা আছে, এবং থাকাও আবশ্যক।

নচেৎ ভগবান 'ইচ্ছার স্বাধীনতা' মানুষকেই কেন দিয়াছেন? এই স্বাধীনতা পুরুষ যেমন তাহার কতকগুলি নির্দ্দিষ্টগণ্ডীতে বিশেষ ভাবে পরিচালনার অধিকার লইয়াছেন, নারীকেও তেমনই কতকগুলি বিশেষ গণ্ডীতে বিশেষভাবে পরিচালনার অধিকার তিনিই ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই ভাগাভাগিটা কেন হইয়াছে, সেকথাটারও কারণ ইতিপূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিতে আমরা ক্রটী করি নাই। সুতরাং নারী পুরুষের একান্ত অধীনা এবং নিজের স্বাধীনতা অনুযায়ী কোনো কিছুই তাহার করার ক্ষমতা নাই—এ অভিযোগ ঠিক নহে।

তবে কি ? পরস্পরের দায়ীত্ব।

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তবে নারী আজ যাহা চাহিতেছে, তাহা পাইতেছে না কেন ? তাহার নিজের অভাব অভিযোগগুলি মিটাইবার মত অর্থ—"ফুরসত বা সুযোগ-সুবিধা আজ তাহার নাই কেন ? উত্তরে এমন একটা প্রতিপ্রশ্নও করা যাইতে পারে—আচ্ছা পুরুষেরাই বা তাহা পায় কৈ ? বস্তুতঃ একপক্ষের অভাব-অভিযোগের জন্য সর্ব্বত্রই যে অপর পক্ষ দায়ী—এ কথা কে বলিবে ? নারীর মত পুরুষেরাও অভিযোগ করিতে পারে—"ওগো, তোমাদের জন্যইতো আমরা গেলাম, তোমাদিগকে আগলাইয়া রাখিতে গিয়া কোনও রকম ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে পারি না, সঞ্চয়

করিতে পারিনা, এমন কি, এদিক-ওদিক পা বাড়াইতেও অক্ষম। তোমরাই আমাদিগকে ঘরের কোণে এমনভাবে কোনঠাসা করিয়া রাখিয়াছ।” এ কথায় নারীর কি উত্তর? হয়ত সে বলিবে, “এ ফাঁস তুমিই সখ করিয়া গলায় পরিয়াছ, এখন আমাদিগকে এ গঞ্জনা কেন? তুমি বিবাহ করিলে কেন? ঘরসংসার সাজাইলে কেন? তারপর, আমাদিগকে এমন ঘরের কোণে কোণঠাসা করিয়াই বা রাখিয়াছ কেন? বেশ, আমাদের ছাড়িয়া দাও, আমাদের গতি আমরাই ঠিক করিয়া লইতেছি।” নারী একথা বলিতে পারে বটে, এবং বলিতে সুরু করিয়াছেও বটে, কিন্তু সময় থাকিতে বুঝিয়া দেখা উচিৎ, এ কথাগুলিইবা কতটা খাটি; এই ঘরসংসার সাজাইবার দায়টা সত্য সত্য পুরুষের একার না উভয়ের; যে সন্তান প্রসব না করিলে বা শিশুর মুখ না দেখিলে তাহার নিজের হিসাবেও তাহার নারীজন্মটা ব্যর্থই থাকিয়া যায়, সেই শিশুর মঙ্গলামঙ্গলের দায় তাহাদের উভয়েরই, না একমাত্র ঐ পুরুষের? যে গৃহের শান্তির কথা এত করিয়া আমরা এতক্ষণ বুঝাইয়া আসিলাম, এবং যাহা শুধু আমাদের হিসাবে নহে, জগতের প্রত্যেক জাতির হিসাবেই অমূল্য, এবং যাহার উদ্দেশেই এই স্ত্রীপুরুষের সম্মিলন—উহার দায়ও একমাত্র এই পুরুষের, কি, সমপরিমাণে নারী ও পুরুষ উভয়েরই?

একটু ধীরতা সহ চিন্তা করিয়া দেখিলে বেশ বোঝা যাইবে যে, এইসব ঘর-সংসার সাজাইবার দায় একমাত্র পুরুষেরই নহে, তুল্যাংশে নারীরও বটে। সুতরাং এ জবাব পুরুষকে দিলে ঠিক হইবে না। [illegible]হা সত্য, তাহা মানিয়া লওয়াই ভাল। এ সম্পর্কে সত্যতত্ত্ব এই যে, [illegible] সংসাররক্ষা-কল্পে নারী ও পুরুষ পরস্পরের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য, এবং যদিও এজন্য অনেক দাবী-দাওয়ার আবশ্যকতা পরস্পরেরই আছে, তথাপি এই দাবী-দাওয়াগুলি রক্ষা করা সর্ব্বত্রই তাহাদের কাহারও হাতের মুঠোতে

নহে। অনেক বাহ্যিক কারণেও (যাহার ওপর তাহাদের কাহারই হাত নাই) এই সকল দাবী-দাওয়া মিটাইতে উভয়পক্ষই অসমর্থ। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছা পূর্ব্বক যদি কোনও পক্ষ প্রতিপক্ষের ন্যায্য দাবীদাওয়া মিটাইতে ত্রুটী করেন, তবে সেপক্ষ অপরাধী বটে, কিন্তু যথায় সামর্থ্য নাই, ইচ্ছা করিলেই বা চেষ্টা করিলেই সেরূপ করার সাধ্য হইয়া উঠে না, সে-স্থলে নিজের ভাগ্যকে ছাড়া অপর কাহাকেও তজ্জন্য দায়ী করা—সঙ্গত হইতে পারে না।

আমাদের তো মনে হয়, নারীর বর্ত্তমান পঙ্গু-অবস্থার মূলে যে ভ্রান্তবুদ্ধি, দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতা রহিয়াছে, উহা নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যেই সমভাবে বিভক্ত। বাহ্যিক অনেক কারণে উভয়েই যথেষ্ট পরিমাণে নিরুপায় বটে, কিন্তু উহাদের নিজেদের ভ্রান্তবুদ্ধি ও অক্ষমতাও যে এ নিরুপায় ভাবটীকে আরও অনেক অধিক প্রবল করিয়া তুলে নাই—সে কথাও ঠিক নহে। নিজেদের চেষ্টায় এই নিরুপায় ভাবটীকে যথেষ্ট খর্ব্ব করিয়া পুরুষ ও নারী উভয়েই তাহাদের নিজেদের ও পরস্পরের অবস্থাটা আরও অনেক উন্নত করিতে পারিত, কিন্তু কেহই তাহা করেন নাই। পুরুষও করে নাই এবং নারী নিজেও নয়। এমন অনেক কাজই ছিল যাহা নারী এই বর্ত্তমান অবস্থার ভিতরে থাকিয়াও ইচ্ছা করিলেই করিতে পারিত এবং উহার ফলে তাহার নিজের এ পঙ্গু অবস্থাটারও অনেক অবসান হইত, কিন্তু এ সুযোগ-সুবিধা নারী নিজেও অবহেলা করিয়াই চাহিয়াছে। যতটুকু স্বাধীনতা তাহার ছিল, সে তাহারও সদ্ব্যবহার করে নাই। স্বাধীনতার ততটুকুরই একান্ত দরকার যতটুকুর সত্য ব্যবহার হইতে পারে। আবশ্যকে স্বাধীনতার ক্ষেত্রমাত্র প্রসারিত করিলেই ফল পাওয়া যায় না। সদ্ব্যবহার করিলে, স্বাধীনতা যত পাওয়া যায় ততই মঙ্গল। কিন্তু যে স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিতে পারিব না উহা প্রাপ্য হইলেও, না পাইলেই বা এত দারুণ অভিযোগ করিব কেন?

নারীর ভুল

আচ্ছা, তোমরা বলিতে পার কি, বঙ্গদেশে এমন সংসার আজকাল কয়টা আছে, যেখানে গৃহকর্ত্তার সঙ্গতি থাকা সত্বেও মেয়েরা ভরণ-পোষণে বঞ্চিত, যেখানে ঠিক নিজের অবস্থা বুঝিয়াই মেয়েরা সর্ব্বদা নিজদিগকে মানাইয়া চলে, এবং আবশ্যক মত গৃহকর্ম্ম সকলই করে, গতর খাটাইয়া মুড়িভাজা, চিড়েভাজা, ধানভানা, সেলাই-রিপুর কাজ—এইগুলি সব করে ; অনেক সহজ সরল কুটিরশিল্প, যাহা একটু পরিশ্রম ও মনোনিবেশ করিলে অনায়াসেই তাহারা করিতে পারে, অবকাশের সময় সেই সবও করিয়া অর্থোপার্জ্জন বা অর্থের অভাবলাঘব করিতে কুণ্ঠিত হয় না ; পরিজনের ও নিজের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া ডাক্তার-কবিরাজ ও ঔষধপত্রের ব্যয়টাকে যথাসম্ভব অনাবশ্যক করিয়া তোলে, অবস্থা বুঝিয়া সকলপ্রকার ব্যয়সাপেক্ষ অনাবশ্যক বিলাসিতাকে বর্জ্জন করে, কি করিলে অল্পখরচেও রন্ধনের গুণে সুখাদ্য প্রস্তুত হয়—বুদ্ধি খাটাইয়া সে ব্যবস্থা করিতেও সর্ব্বদা যত্নবতী হয়, গৃহের প্রত্যেক অপচয় নিবারণে তীক্ষ্ণদৃষ্টি সর্ব্বদা প্রয়োগ করে, অবকাশের সময় বিদ্যাচর্চ্চায় মন দেয় এবং বালকবালিকাদিগকে সর্ব্বদা সদুপদেশ ও সৎশিক্ষা দিয়া থাকে ?

বাহিরের পথ সকলের জন্য নয়

সংসারের হিসাবপত্র রাখা, পরিবারের সেবাশুশ্রূষা, রন্ধন, অতিথিসেবা শিশুপালন, বালকবালিকাদিগকে শিক্ষাদান, ব্রতপূজাদি,—প্রতি পরিবারের এইগুলিই নিত্যাবশ্যকীয় কার্য্য। কাহাকেও না কাহাকেও প্রতিনিয়ত এই সব ভার বহন করিতেই হয়। নিজের লোক না থাকিলে গৃহস্থকে মাহিয়ানা-করা লোক রাখিয়াও এইসব করাইতে হয়। ইষ্টসাধনের সুযোগ-সুবিধা এবং স্বাধীনতার জন্যই যাঁহারা ব্যগ্র, অথচ তেমন কোনও বিশেষ যোগ্যতা বা শিক্ষার অধিকারিণী নন, এমত সাধারণ শ্রেণীর

নারীগণকে একথাটা আমরা আরও একটু পরিষ্কাররূপেই বুঝাইতে চাহিতেছি। ধর, পুরুষের ন্যায় সকল প্রকার বাহিরে আত্মনিয়োগ করিবার স্বাধীনতাই তোমাকে দেওয়া হইল। অতঃপর তুমি কি করিবে? সর্ব্বোপরি পেটের দায়। জীবিকার সন্ধানেই প্রথম তোমাকে ব্যস্ত হইতে হইবে নিশ্চয়। গোড়াতেই উমেদারী। বিষয়টা তেমন প্রীতিপ্রদ বা সহজ নয়। বর্ত্তমান প্রথায় নারীর এ বালাই আদবে নাই। গৃহের চাকুরীটী বিনা উমেদারীতেই সর্ব্বত্র লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু বাহিরের কথাটা স্বতন্ত্র! সেখানে অনেক পরীক্ষা দিয়া, অনেকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়াই তবে কাজে ভর্ত্তি হইতে হয়। আচ্ছা তারপর? কাজে ভর্ত্তি হইলে তো, এইবার পারিশ্রমিকটা কিরূপ? অবশ্য, যোগ্যতানুযায়ীই। কিন্তু এই যোগ্যতা যাহাই হউক, তোমার নিজের খরচটাও ইহারই যে অনুযায়ীই ছোটবড় হইবে, ইহাও সুনিশ্চিত। যাক—যদি কোনও পরিবারে গৃহস্থালীর কাজেই নিযুক্ত হও, যে ১০।১৫ টাকা মাহিয়ানা বাবত এইখানে পাইবে, নিজের ভরণ-পোষণেই ব্যয়িত হইবে। কিছু সার্থকতা হইল না। আপন ঘরেও এই সুবিধাটুকু ছিল, এই কার্য্য করিয়াই জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারিতে। বাহিরে, লাভের মধ্যে পাইলে অনাত্মীয় মুনীবের ভ্রুকুটি ও তর্জ্জনগর্জ্জন, ও সময়ে-অসময়ে কাজ আদায়ের তাড়াহুড়া। আবার, বাহিরে যখন এই অবস্থা তোমার হইল, গৃহে তোমার স্বামী বা বাপ-ভাইয়ের অবস্থা কি, সেইটীও চিন্তনীয়। তোমার অভাবে গৃহস্থালীর যে কাজ-কর্ম্মগুলি বাকী পড়িয়া রহিল, সে সকল কে করে? উহাদের জন্য তোমার অভিভাবককে আবার একটী মাহিয়ানা-করা লোক কোথাও হইতে খুঁজিয়া পাতিয়া আনিতে হইবে নিশ্চয়। বাহির হইতে তুমি যাহা উপার্জ্জন করিয়া আনিলে, উহাকে দিতেই পুনঃ উহা বাহির হইয়া গেল, আবার বাড়ার ভাগ এ-ও হইল যে, আপনার লোকের একনিষ্ঠ সেবার বিনিময়ে তোমার আত্মীয়-পরিজন ও

শিশুসন্তানেরা পাইল ভাড়াটিয়া একজন সেবক বা সেবিকা—তোমার সংসারের ভালমন্দের চাইতেও যাহার নিজের উপার্জ্জনের প্রতিই নজর রহিবে অধিক।

সুতরাং, ইষ্টসাধনকল্পে অন্ততঃ এই শ্রেণীর নারীদের অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত বাহিরে ছুটিবার কিছু সার্থকতা দেখা যায় না। আর এ জাতীয় সাধরণ নারীর সংখ্যাই তো এদেশে অধিক। বলা যায়, অন্ততঃ এই শ্রেণীটির জন্য বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে পূর্ণভাবে এখনও আত্মনিয়োগ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার সুযোগ-সুবিধা ও স্বাধীনতা যথেষ্টভাবেই রহিয়াছে। ঘরের এই সুনিশ্চিত চিরলভ্য বাঁধা চাকুরীটা ফেলিয়া নারী আজ যদি অনিশ্চিত কোনও স্বার্থের সন্ধানে নিজের খুসীতে বাহিরে ছুটিয়া যাইতে চায়, তাহার এই বাতুলতায় সত্যসত্য কোন্ ইষ্ট সাধিত হইবে?

অবশ্য, অর্থোপার্জ্জন ব্যতীত, এই শ্রেণীর পক্ষেও বাহিরের স্বাধীনতা চাওয়ার অপর উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। তা'র শিক্ষার দাবী, সমাজের ও দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগের আকর্ষণ, দশের সঙ্গে মেলা-মেশা করিয়া চিত্তের আনন্দ ও উদারতাকে প্রশস্ত করিবার সদিচ্ছা এসকলও—থাকা সম্ভব ও স্বাভাবিক।

এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমাদের অন্তঃপুরপ্রথা এ গুলিরও প্রতিকূল নহে। আমাদের অন্তঃপুরপ্রথার বিশিষ্ট বন্ধনগুলিকে অটুট রাখিয়াও এইসব উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণেই সুসিদ্ধ করা যায়। যদি এই উদ্দেশ্যগুলিকে সুসিদ্ধ করিবার সুযোগ-সুবিধা পাইয় ও পারিবারিক সুব্যবস্থাটাকে বজায় রাখিতে পারি, তবে কেনই বা [illegible] না করিব? যাহার রথদেখার ও কলাবেচার দু'টো দায়ই রহিয়াছে, সে রথ দেখিতে যাইয়া কলাই বা না বেচিয়া ফিরিবে কেন? অহল্যাবাঈ, রাণীভবানী, রাণী স্বর্ণময়ী ইহারাও অন্তঃপুরের মহিলাই ছিলেন। সাধারণশ্রেণীর রমণীদিগের কথা ইতিহাসে উঠে না; কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা হইতে

এমন অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের রমণীদের কথাও আমরা জানি, যাহারা এই প্রকারে অন্তঃপুরবাসিনী হইয়াও শিক্ষিতা ছিলেন এবং দেশের ও দশের অনেক উপকারই করিয়া গিয়াছেন। এই সকল অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের কীর্ত্তির তুলনায় আমাদের আজকালের স্বাধীনতাপ্রাপ্তা নব্যা মহিলাদের এই জাতীয় কৃতিত্ব বহুলাংশেই নগণ্য। বাহিরের শিক্ষা ও সদনুষ্ঠানের অভিমান যতই তাঁহাদের থাকুক, উহারা যে দেশের কাজে বা দশের কাজে এই স্বাধীনতামূলেই অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে সর্ব্বদাই পশ্চাৎ ফেলিয়া যাইতে পারিয়াছেন, এমন দেখিতে পাই না। ক্বচিৎ-কদাচিতের কথা আমরা ধরিব না। যে-দায়ে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু বা শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ প্রভৃতির মত নারীনেতৃবর্গের সর্ব্বত্র আজ ডাক পড়িয়াছে সে-দায় সর্ব্বত্র বা সর্ব্বসাধারণের হয় না। তেমন অবস্থার কথা ধরিয়া এখন আমরা কথা কহিব না। ক্ষেত্র অন্যরূপ হইলে এ-ডাক হয়ত তাঁহাদের ওপরেও না আসিতে পারিত, এবং তখন হয়ত এজাতীয় স্বাধীনতার সাহায্য ব্যতিত দিগন্তরে তাঁহারা অন্যবিধ উপায়েও এমনই ধন্য হইবার অবকাশ পাইতেন। শিবাজীজননী জিজিবাঈ, মেবারের ধাত্রী পান্না, আমাদের বর্ত্তমানকালের মহাকালী পাঠশালার স্থাপয়ত্রী সন্ন্যাসিনী মাতাজী—ইঁহারাও এই জাতীয়া রমণীই ছিলেন। সর্ব্ব-সাধারণের অনুকূল বর্ত্তমান অবস্থার ধারা লইয়াই এইক্ষণ আমরা কথা কহিতেছি। আজকাল ইহাই দেখিতে পাই যে, বাহিরের বিদ্যা বা বাহিরের সুবিধা-সুযোগ নারীদিগকে সত্যকার উন্নতির পথে সত্যই খুব বেশীদূর লইয়া যাইতে পারে না। যে শিক্ষাদীক্ষা বা মনের বল এবং সমাজ বা দেশের কল্যাণের প্রেরণা ও ইঙ্গিৎ, অন্তঃপুরে বসিয়া অহল্যাবাঈ ও রাণীভবানী আরত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আজকাল বাহিরের 'এম-এ' 'বি-এ' পাশে বা অপর শত সুবিধা-সুযোগে উহারা আর ধরা পড়িতেছে না। আরও দেখিতে পাই যে, এই সকল বাহিরের বিদ্যা ও সুবিধা-সুযোগের

ফলে উপার্জ্জন ক্ষমতাটা যদি বা কিছু বৃদ্ধি পাইল, আবার উহার সঙ্গে সঙ্গেই অনিবার্য্যভাবে এমন একটী বিলাসিতার ভাবও আসিয়া পড়িল যাহার প্রভাবে ঐটীর সার্থকতাও মাটী হইয়াই গেল। আয়ের সঙ্গে সঙ্গে খরচের মাত্রাও তখন এত বাড়িয়া উঠে যে, তখন স্থিতির ঘরে শূন্য ছাড়াইয়াও অনেক সময় বিয়োগের চিহ্নই পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং দেশের ও দশের উপকার দূরে থাকুক, দেখা যায়, অনেক সময়েই ইহাদের দ্বারা তাহাদের নিজের উপকারও যথেষ্ট হইয়া উঠে না এবং এই বাহিরে আত্মনিয়োগ করার সার্থকতাটা শেষ পর্য্যন্ত একমাত্র ঐ বিলাসিতায়ই পর্য্যবসিত হইয়া যায়। পাঠিকাঠাকুরাণীরা ক্ষমা করিবেন, দেখিয়া শুনিয়া আমাদের মনে এ সন্দেহটাও অনেক সময়েই প্রবল হইয়া উঠে যে, হয়ত বা ঐ বিলাসিতার প্রলোভনটাই বর্ত্তমানে অনেকক্ষেত্রে নারীর পক্ষে বহির্গমনের সত্য আকর্ষণ।

কিন্তু অনেকক্ষেত্রের কথা কহিলাম বলিয়াই সকল নারীর সম্বন্ধেই যে এমন অভিযোগ আমরা আনিতেছি, এমন ধৃষ্টতা রাখি না। সত্য সত্য সদ্‌সঙ্কল্প লইয়াও আজকাল অনেক নারীই এ পথে ছুটিয়া যাইতেছেন; বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান এই স্বরাজ-সাধনার যুগে এ কথাটা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যাহাহউক্, এই স্বরাজ-সাধনার যুগের কথাটা অতঃপর আমরা একটু স্বতন্ত্রভাবেই উল্লেখ করিব, সে-সম্পর্কে এস্থলে আর বেশী কিছু না কহিয়া অত্যাবশ্যকীয় আর দু'চারিটী কথা যাহা বাকি আছে বলিয়াই বক্তব্য শেষ করিতেছি।

সত্য সত্য পরের দুঃখে বা দেশের দুঃখে কাহারও বাহিরে ডাক পড়িয়া থাকেতো, তিনি সেদিকে যাউন, উহাতে কাহারও আপত্তি নাই, বরং উৎসাহ দিবার এবং নানাভাবে ত্যাগ স্বীকার করিয়াও সহায়তা করিবারই বাধ্যবাধকতা আছে। পরের

জন্য যে ভাবিতে বা ত্যাগস্বীকার করিতে শিখিয়াছে, সে নারী হউক, পুরুষ হউক, কোনও পরিবার-বিশেষের একার সামগ্রী নহে। সে শুধু বাহিরেরও নয়, ভিতরেরও নয়। দশের জন্য এবং ভিতর ও বাহির—এই উভয়ের জন্যই ভগবান তাঁহাকে এজগতে পাঠাইয়াছেন, সে এই উভয়েরই কার্য্য করিবে। কিন্তু এশ্রেণীর লোকের সংখ্যা স্বভাবতঃ কোন সমাজেই খুব অধিক নয়, এবং তাঁহাদের উপর এই বাহিরের ডাক খুব ব্যাপকভাবে ক্বচিৎ-কদাচিতই আসিয়া থাকে। সুতরাং এই বিশেষ কালের ও বিশেষ বিশেষ পাত্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট পথটী সর্ব্বসাধারণের সচরাচর চলিবার পথও নয়।

সুতরাং সাধারণতঃ যতক্ষণ পারা যায়, এই অন্তঃপুর প্রথাটা বজায় রাখিয়া চলাই শ্রেয়ঃ, যথায় তাহা না পারা যাইবে অর্থাৎ এই অন্তঃপুরের গণ্ডীটী সত্যসত্যই কাহারও সর্ব্বাঙ্গীন ইষ্টসাধনের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে, তথায় এগণ্ডীটী অতিক্রান্ত হইতে পারে। এমতস্থলে নারীকে এ সুযোগসুবিধা দেওয়া সমাজেরও কর্ত্তব্য।

সমাজের মুস্কিল—প্রতিকার কি ?

কিন্তু, একথায় সমাজের অবস্থাটা একটু জটিল হইয়া উঠে নিশ্চয়ই। সমাজ কি করিবে ? একই সমাজে ভিন্ন ভিন্ন দলের নিমিত্ত একাধিক নিয়মের ঠাঁই নাই। একদল অন্তঃপুর-প্রথায় চলিবে, আর অপরদল চলিবে না—এমত হইতে পারে না। এই জটিল অবস্থায় শুধুমাত্র এক মীমাংসাই সম্ভব। যদি সত্যসত্যই এই দুইদলের সংখ্যাই গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়, সমাজ এমন কোনও মাঝামাঝি ব্যবস্থা করিবেন, যাহাতে পুরোপুরিভাবে না হউক, অন্ততঃ আংশিকভাবেও এই উভয়দলের স্বার্থই সংরক্ষিত হইতে পারে। আজ এ ইঙ্গিতটাই আমরা সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিতে

চাই। আজ যদি আমাদের দেশের সর্ব্বত্র নারীদের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শিক্ষালয়, সঙ্ঘ, সমিতি, লাইব্রেরী, ক্রীড়াকৌতুকের স্থান, শিল্প-কারখানা ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রাদি যথেষ্ট পরিমাণে খোলা যায় এবং আমাদের পর্দ্দাপ্রথাটাকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করিয়া (যেমন পূর্ব্বেও ছিল এবং এখনও কাশীতে ও মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে দৃষ্ট হয়) নারীদিগকে অবাধে আমরা এই সকল অনুষ্ঠানে যোগ দিবার অধিকার দেই, আমাদের মনে হয়, তাহা হইলে এই উভয়দিগের স্বার্থই যথাসম্ভব রক্ষিত হইতে পারে। হিন্দুর পারিবারিক সুখশান্তিও বজায় থাকে, অথচ বাহিরের সুবিধা-সুযোগগুলিও বহুলভাবে প্রায় সকল শ্রেণীর নারীর অধিকারেরই আসিয়া যায়। এ জাতীয় চেষ্টা এপর্য্যন্ত যে কিয়ৎপরিমাণে না হইয়াছে তাহা নয়, কিন্তু যাহা হইয়াছে, প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনকল্পে উহারা প্রচুর নয়; এচেষ্টা আরও অনেক হওয়া উচিৎ, এবং নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ও পল্লীতে পল্লীতে হওয়া উচিৎ।

কর্ম্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের একত্রভাব

নারী ও পুরুষকে একত্রিতভাবে যাঁহারা এইসব অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বলেন, আমরা তাঁহাদের সমর্থন করি না। পুরুষের সহিত অবাধ মেলামেশায় ইষ্ট অপেক্ষা নারীর পক্ষে যে অনিষ্টের সম্ভাবনাই অনেক অধিক, এবিষয়ে অনেকেই নিঃসন্দেহ। আমরা স্থানান্তরে এসম্পর্কেও কিছু কিছু যুক্তিতর্ক ও প্রমাণাদি দিতে চেষ্টা পাইয়াছি।

আসল কথার কি বুঝিলাম?

যাহা হউক, এত সব আনুসঙ্গিক কথার আলোচনার পর আমাদের মূলকথা সম্বন্ধে কোথায় কতটা কি মীমাংসা পাওয়া গেল, এইবার সে-বিচার করা যাউক্। দেখিলাম—

(ক) হিন্দুসমাজে মেয়েরা যে সত্যসত্যই পুরুষের 'দাসা-বাঁদী' বা একান্তভাবেই হাতধরা, এ কথাটা বহুলাংশে ভুল। তাহাদের পঙ্গু অবস্থার নিমিত্ত আমাদের সমগ্র সমাজের অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং বর্ত্তমান অসহায় ভাবটাই বিশেষ করিয়া দায়ী। অন্তঃপুরপ্রথা কেবল পুরুষের সুবিধার নিমিত্তই নহে; সংসারের কাজে নারী ও পুরুষের এই ভাগাভাগির প্রথাটা উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষেই তুল্য কল্যাণকর, এবং এই কল্যাণামৃতে পুরুষের ন্যায় নারীও তুল্যভাবে অধিকারিণী। এই উভয় সম্প্রদায়ের ইষ্টের নিমিত্তই উভয় সম্প্রদায়েরই যথাসাধ্য এই প্রথাটীকে রক্ষণ করা কর্ত্তব্য। নারী-পুরুষভেদে যাবতীয় কার্য্যের এই ভাগাভাগির মূলেই বিচার-বিবেচনা আছে। যে কার্য্যে যিনি যোগ্যতর তাঁহাকে সে কার্য্যের ভারই দেওয়া হইয়াছে। কোন অসাধু মতলবে বা অন্ধ খেয়ালের উপরে এ ব্যবস্থা হয় নাই।

(খ) এই অন্তঃপুরের মধ্যেও নারীর এতসব দায়ীত্ব ও কর্ম্মক্ষেত্র আছে, যাহা পুরুষের ক্ষেত্রগুলি হইতে গুরুত্বহিসাবে বা মানে-মর্য্যাদায় একচুল কম নয়। এই সকল কর্ম্মক্ষেত্রের সমস্ত সুবিধা-সুযোগই গ্রহণ করিয়া আমাদের নারীগণ যে এ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য শেষ করিতে পারিয়াছেন, এমন মনে হয় না। এসব ক্ষেত্রে তাহাদের এখনও অনেক কিছুই করার রহিয়াছে এবং সেগুলি করিতে পারিলেও তাহাদের বর্ত্তমান অসহায়ভাবটী বহুলাংশে বিদূরিত হয়। নিজক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অনা-বশ্যকে তাহারা যদি পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্রটীতে ভাগ বসাইতে ছুটেন, তাহাতে প্রকৃত কল্যাণ কিছু হইবে না, পরন্তু গৃহের

সুখ-শান্তি ও শৃঙ্খলাকে অযথাই ভঙ্গ করা হইবে এবং এইভাবে একটা প্রকাণ্ড ইষ্টকেও অযথা চিরবিদায় দিতে হইবে।

(গ) পুরুষের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে চলিলেই যে পরিবারের বা দেশের অর্থসমস্যার প্রতিকার হয়, এ ধারণাটীও খাঁটি নহে। দেশের ও দশের কল্যাণে নারী অন্তঃপুরে ও বাহিরে সর্ব্বত্রই আত্মনিয়োগে অধিকারিণী—একথা মানি; কিন্তু অন্তঃপুরের কর্ত্তব্য হইতে বাহিরের কর্ত্তব্য যখন সত্যসত্যই বড় হইয়া উঠে (তা' সে দেশের প্রয়োজনেই হউক বা নিজের প্রয়োজনেই হউক) তখনই তাহার এ অধিকার আইসে। আর তখনও, এই উভয়দিকের ডাক রক্ষা করিয়া যদি তাহার কোন চলিবার উপায় থাকে, তবে উহাই শ্রেয়ঃ। বাহিরের কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়াও যতক্ষণ বা যতটা সম্ভব অন্তঃপুরের বন্ধনগুলিকে রক্ষা করাই কর্ত্তব্য।

(ঘ) আপদ-বিপদের সম্ভাবনা হইতেই এই অবরোধপ্রথা ও পর্দ্দাপ্রথার আবশ্যকতা। চেষ্টা-উদ্যোগেও নানা অনুষ্ঠানের সহায়তায় এই আপদ-বিপদের সম্ভাবনাগুলিকে বিদূরিত করিয়া রাখিতে পারিলে আর উহাদের প্রয়োজনীয়তাও থাকে না। সে দায় সমাজের। এ দু'টা বালাই হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে নারী ও পুরুষকে সমভাবে পূর্ব্বাহ্ণে সে চেষ্টা করিতে হইবে।

(ঙ) যতদিন নারী অন্তঃপুরে থাকিবে, ততদিন বাহিরের বিপদ-আপদ ও ভালমন্দ হইতে তাহাকে রক্ষা করা এবং

তাহার স্বাস্থ্যরক্ষার, সদ্‌শিক্ষার ও কুসংস্কার অপনোদনের চেষ্টা দেখা—পুরুষেরই দায়। প্রাচীনকালে এ দায় পুরুষের এত ছিল না, যত আজকাল হইয়াছে। নারীর অনেক ন্যায্য দাবী আজকাল তাহারা পূরণ করিতে অক্ষম, পরন্তু অনেক বিকৃত শিক্ষা ও বিকৃত রুচি অন্তঃপুরে ঢুকাইয়া এমন অনেক অনায্য দাবীকেও সখ করিয়া আজ তাহারা আমন্ত্রণ করিয়া ঘরে আনিতেছেন, যাহার ফলে সত্য মিথ্যা অভিযোগের মাত্রা নারীরও আজকাল বহুগুণেই বড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং এই বর্ত্তমান অসহায়ভাব বা অসন্তোষের নিমিত্ত পূর্ব্ব-পুরুষদিগকে দায়ী করা ভুল। এ অবস্থার জন্য প্রধানতঃ দায়ী আমরাই। নারীর ন্যায্যদাবী পূরণ করা এবং সদ্‌শিক্ষা ও সদুপদেশ দ্বারা তাহার বিকৃত-রুচি ও কুসংস্কারকে বিদূরিত করিয়া সকল প্রকার অন্যায় দাবীর মূলচ্ছেদ করা—এগুলি পুরুষদেরই কার্য্য। কালানুযায়ী নানা নূতন কর্ত্তব্যে ও সদনুষ্ঠানে তাহাকে উৎসাহিত ও অনুরক্ত করা এবং তদনুযায়ী সম্ভবমত সকলপ্রকার সুবিধা-সুযোগ ও অনুষ্ঠান করিয়া দেওয়া—এগুলিও তাহাদেরই কর্ত্তব্য।

নারী পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র সর্ব্বত্র সমান নহে ; সমান হওয়ার উপায়ও নাই

এই সকল কথা হইতে আমাদের মূলপ্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করা, আশা করি, অনেকটা সরল হইয়া আসিয়াছে। হয়ত বোঝা গিয়াছে, নারীর ও পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র সর্ব্বত্রই এক নয় ; বস্তুতঃ বিভিন্ন। কিন্তু এই 'সর্ব্বত্র' কথাটার আর একটুখানি বিশেষ বিশ্লেষণের প্রয়োজন। একটু

অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বোঝা যাইবে যে, মানবের সমগ্র কর্ম্মক্ষেত্র-টাকে মোটামুটিভাবে তিনটী ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—

(১) যাহা বিশেষ করিয়া পুরুষেরই সাধ্য ও যোগ্য।

(২) যাহা বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকেরই সাধ্য ও যোগ্য।

(৩) যাহা নারী ও পুরুষ উভয়েরই সমভাবে সাধ্য ও যোগ্য।

যদিও পুরুষ ও নারীভেদে কর্ম্মক্ষেত্র বিভিন্ন এইরূপ বলা হইয়াছে, তথাপি বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই এটা অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন যে, আহার-নিদ্রাদি সকল কাজই আর কিছু এইরূপ একচেটিয়াভাবে কাহারও বিশেষ অধিকারগত নয়। শুধু প্রাকৃতিক নিয়মের বশে নয়, প্রয়োজন বশতঃও ছোটবড় অনেক কাজেই আমরা পুরুষ ও নারীকে সমান অধিকার দিতেছি। বিদ্যার্জ্জন, ঈশ্বরারাধনা, দেবার্চ্চনা, গ্রন্থাদি-লেখা, চিত্রাদি কলাবিদ্যানুশীলন ইত্যাদি কাজ যে নারী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই করিতে পারেন এবং সর্ব্বত্র করিয়াও আসিতেছেন—একথা বোধ হয় সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং নারী ও পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র যে সর্ব্বত্রই বিভক্ত এবং কোন ক্ষেত্রেই উহাদের যে সমান অধিকার নাই, এমন কথা কে সাহস করিয়া কহিবে? তবে, কতকগুলিক্ষেত্রে এ বিভাগ অবশ্যই আমরা করিয়াছি এবং উহা সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণের নিমিত্ত বাধ্য হইয়াই আমাদিগকে করিতে হইয়াছে। কামারের কাজ কুমরের হাতে দিলে বা কুমরের কাজ কামারের ঘাড়ে চাপাইলে—কোন পক্ষেরই লাভ নাই; পরন্তু উভয় পক্ষেরই অযথা অনেক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। সুতরাং, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রগুলি হিন্দুসমাজে বিশেষ করিয়া এইরূপে নারীর জন্যই নির্দ্দিষ্ট এবং কেনই বা এইভাবে নির্দ্দিষ্ট এবং এই নির্দ্দেশগুলি একবারেই চিরস্থায়ী কি না, বা স্থান, কাল ও পাত্রভেদে পরিবর্ত্তনসাপেক্ষও বটে,—অতঃপর এ কথাগুলি দ্রষ্টব্য।

নারীর আদর্শ

And I say, it is as great to be a woman as to be a man,
And I say, there is nothing greater than the mother of man,

Walter Whitman.

স্ত্রীজীবনও পুরুষজীবনের মতই ধন্য ;
মা হওয়ার অপেক্ষা বড় জিনিষ জগতে আর নাই।

নারীর কর্ম্ম-যোগ

নারীর আদর্শ

কর্ত্তব্য ও আদর্শ—পরস্পরের নির্ভরতা

নারীর কর্ম্মক্ষেত্র পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে স্থলবিশেষে স্বতন্ত্র, একথা বলা হইল, কিন্তু তাহার এই স্বতন্ত্র ক্ষেত্রগুলি কি—সেসম্বন্ধে এখনও কোনও আলোচনা হয় নাই। কিন্তু সে কথা বুঝিতে হইলে তদগ্রে 'নারীর আদর্শ কি' এ কথাটীরও বিচার-বিবেচনা আবশ্যক।

বস্তুতঃ, আদর্শের বিচার-বিবেচনা বাদ দিয়া কোনো-কিছুরই কর্ম্ম-ক্ষেত্র স্থির হয় না। আদর্শের সঙ্গে কর্ত্তব্যের বড় নিবিড় সম্বন্ধ। নারীকে কি উদ্দেশ্যে ভগবান এ জগতে পাঠাইয়াছেন, এ সম্বন্ধে কি তাঁহার নির্দ্দেশ, নারী কি ভাবে চলিলে সত্যসত্য এ জগতে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ক কোন কিছু স্থির ধারণায় না পৌঁছিতে পারিলে, নারী যে কিভাবে আসিয়া এজগতে আত্মনিয়োগ করিবে—সে বিচারে বসাও বিড়ম্বনা মাত্র।

নারীর আদর্শ সর্ব্বত্র সমান নয়

কিন্তু এই 'নারীর আদর্শ'টা সর্ব্বদেশে বা সর্ব্বকালেই যে এক—এমন দেখিতে পাই না। কি করিয়াই বা এক হইবে? মানুষের জ্ঞান-বিশ্বাসও সর্ব্বত্র এক নয়, আবার কালে কালে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনও যথেষ্ট। বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিশ্বাস লইয়া বিভিন্ন প্রকারেই দেশে দেশে মানুষ নারীজীবনের লক্ষ্য স্থির করিতে চেষ্টা পায় এবং সেই

অনুযায়ী তাহাদের লক্ষ্যাভিমুখী গন্তব্যপথগুলিকেও একাধিকরূপেই স্থির করিয়া লয়। আবার লক্ষ্য যথায় এক, তথায়ও দেখি, কালে কালে ওই গন্তব্যপথগুলিতে অদল-বদলও যথেষ্টই ঘটে ; লক্ষ্য এক, কিন্তু পথঘাটের সুবিধা-অসুবিধার দরুণ পথগুলিকে অনেক সময়েই আঁকাইয়া বাঁকাইয়া স্থানান্তর দিয়া মানুষ লইয়া যায়। সুতরাং দেশকাল-বিশেষে একদিকে যেমন নারীজীবনের লক্ষ্যগুলি বিভিন্ন, তেমনই আবার উহাদের যাত্রা-পথ বা কর্ম্মক্ষেত্রগুলিতেও রূপান্তরের সীমা নাই।

হিন্দুনারীর আদর্শই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

কিন্তু এত সব বিভিন্ন আদর্শের মধ্যেও, বলা যায়, হিন্দুর আদর্শটী বস্তুতঃই অতি বিচিত্র এবং বোধ হয় গৌরবে ও সার্থকতায় সমগ্র জগতে কোথায়ও আর ইহার তুলনা নাই। অশ্রুতপূর্ব্ব ত্যাগ ও নিষ্কাম সাধনার উপর ইহার আসন। দুঃখের বিষয়, এ ত্যাগের ও সাধনার মহিমা আজকাল আমরা ভুলিতে বসিয়াছি।

মানুষের লক্ষ্য বা আদর্শ সম্বন্ধে জগতে একশ্রেণীর লোকের ভাব এই যে—এ সংসারে আসিয়া যে কয়টা দিন বাঁচিয়া থাকিতে হইবে সে কয়টা দিন যার যার জীবনটাকে যথাসাধ্য একটু সুখসাচ্ছন্দ্যে ও আনন্দের মধ্যে কাটাইয়া দিতে পারিলেই হইল, তজ্জন্য যতটুকু সাবধানতা বা সতর্কতা লওয়া বা চেষ্টা-উদ্যোগ করা আবশ্যক ততটুকুই লইতে বা করিতে হইবে, তদতিরিক্ত নহে। কি পুরুষ, কি নারী, মানুষমাত্রই এইরূপ লক্ষ্যাভিমুখী হইয়াই সর্ব্বদা কর্ম্মক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করিবে। আবার এ সম্বন্ধে কোনও কোনও শ্রেণীর ভাবটা এই যে, মানুষ যে শুধু নিজের জন্যই ভাবিবে তা নয়, পরের জন্যও ভাবিবে বটে, কিন্তু এ দৃশ্যমান জগৎটাই সর্ব্বস্ব। ইহার বাহিরে কি আছে, কি নাই, কে জানে। আপনার জন্যই হউক, আর পরের জন্যই হোক, যাহা কিছু করিতে হইবে, এ জগৎটার

হিসাবেই করিতে হইবে, নিজের সুখসাচ্ছন্দ্য ও এ জগতের উন্নতি ও পরিপুষ্টির জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুর সঙ্গেই মানুষের কর্ত্তব্যের সম্বন্ধ, আর সেই কর্ত্তব্য পালন করাই মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ও কার্য্য। কিন্তু মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য হিসাবে এই দুইটীর কোনটাই হিন্দুর আদর্শ নয়। হিন্দুর আদর্শের মাপকাঠি আরও অনেক উচ্চ ও বড় এবং এই হেতু তাঁহাদের কল্পিত নারীর আদর্শটাও অবশ্যই আরও অনেক অধিক শ্রেষ্ঠ।

জীবনের অনন্ত যাত্রাপথে একটা লৌকিক জীবনকে হিন্দুরা খুব বড় স্থান দেন নাই। জীবের অন্তহীন পথ-রেখায় একটা লৌকিক জীবনকে একটী বিন্দুমাত্র এবং এই আমাদের পৃথিবীর মত এক একটা কর্ম্মক্ষেত্রকে তাহারা এক একটা গ্রন্থিতুল্য—এইরূপই মনে করিতেন; আর লোকের পর লোক, জীবনের পর জীবনের মধ্য দিয়া মানুষ যে কি করিয়া তাহার ওই অনন্তযাত্রাপথটী সহজে ও অত্যল্প বাঁধা-বিপত্তিতে উত্তীর্ণ হইয়া গন্তব্য স্থানে যাইয়া পৌছিতে পারিবে—সেই ছিল তাঁহাদের চরম ও সর্ব্বশেষ লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের অনুযায়ীই তাঁহারা তাঁহাদের আদর্শের মাপকাঠিটী গড়িয়াছিলেন, আর উহার অনুযায়ীই ছিল তাঁহাদের সর্ব্ববিধ 'কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের' ব্যবস্থা। অবশ্য ঐহিক সুখ-দুঃখ ও সুবিধা-অসুবিধাগুলিকেও একবারে অগ্রাহ্য করা চলে না। কেহ তাহা পারেন নাই, তাঁহারাও পারেন নাই। সুতরাং এমন সব ব্যবস্থারই তাঁহারা পক্ষপাতী ছিলেন, যেগুলি ঐহিক পারত্রিক এই উভয়বিধ স্বার্থরক্ষাকল্পেই অনুকূল। অর্থাৎ, যেভাবে জীবন-যাপন করিলে এসংসারেও যথেষ্ট নির্ব্বিবাদে চলা যায়, অথচ পরিণামেও ভগবৎ কৃপা লাভ হয়—সেই ভাবের ব্যবস্থা করাই ছিল তাঁহাদের এই সকল আদর্শরচনার মূলমন্ত্র। কিন্তু এভাবের ব্যবস্থা করিতে যাইয়া, নারী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র একই প্রকার বিধি-বিধান প্রণয়ন করিবার সুযোগ-সুবিধা তাঁহারা কিন্তু খুঁজিয়া পান নাই।

সৃষ্টিমূলেই নারী ও পুরুষের আদর্শ বিভিন্ন

নর ও নারী—মনুষ্যপদবাচ্য হইলেও ইহারা উভয়েই যে স্বতন্ত্র বস্তু, ইহা তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং এই স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেই উহাদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কর্ত্তব্য বিষয়ে ভগবানের যে স্পষ্ট ইঙ্গিৎ রহিয়াছে, উহাও তাঁহাদের নজর এড়ায় নাই। বস্তুতঃ, শুধু মানবজাতির মধ্যেই নয়, অপরাপর ইতর জীবদিগের মধ্যেও, স্ত্রী-পুরুষ হিসাবে শরীরগত, রুচিগত ও স্বভাবগত কতকগুলি পার্থক্য দৃষ্ট হয়, এবং তদনুযায়ীই তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বৃত্তির প্রাধান্যেরও ইতরবিশেষ যথেষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। এই পার্থক্য ও তজ্জনিত বৃত্তিনিচয়ের তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই এরূপ বোধ জন্মে যে, জীবমাত্রকেই সংসারের দায়ীত্বটা, এইরূপ স্ত্রী-পুরুষ হিসাবে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে রহিয়াই একযোগে নির্ব্বাহ করিতে হয়—আর ইহাই যেন ভগবানের ধ্রুব ও সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ। জীবের সমগ্র কর্ম্মক্ষেত্রটী এই ভাবেই যেন স্ত্রী-পুরুষ এই উভয় শ্রেণীর ভিতরেই সমভাবে বিভক্ত। কেহই একা সম্পূর্ণ নয় এবং কাহাকে বাদ দিয়া এ সংসারে যে কেহ একা চলিবেন—সে ভরসাও করা চলে না।

ভগবানের এ ইঙ্গিৎটা মনুষ্যসমাজেই আবার সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট। হৃদয়, মস্তিষ্ক ও অপরাপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির শক্তিসামর্থ্য ও গুণের প্রভেদে স্ত্রী-পুরুষ যথার্থ ই বিভিন্ন। এমন অনেক ক্ষেত্র দৃষ্ট হয়, যথায় পুরুষের ক্ষমতা নারীর ক্ষমতা হইতে বহুগুণে অধিক, আবার এমন ক্ষেত্রও অনেক আছে, যথায় নারীর ক্ষমতাই প্রবলতর ও যোগ্যতর; প্রতিযোগিতায় পুরুষ তাহাকে আঁটিয়া উঠেন না। শুধু এই শক্তিসামর্থ্যের [illegible]র্থক্যবশতঃই নয়, রুচি ও স্বভাবভেদেও নারী-পুরুষের মধ্যে যোগ্যতার এই তারতম্যটা নিয়ত লক্ষিত হইয়া থাকে। সহানুভূতি, করুণা ও দয়া—এই জাতীয় কোমল বৃত্তিগুলি বিশেষ করিয়া নারীহৃদয়েই বেশী স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, আবার সংসারের যাবতীয় কঠোর ও দৈহিক শ্রমসাধ্য কর্ম্মক্ষেত্রগুলিতে দেখা যায়,

পুরুষদিগেরই অধিকার ও অনুরাগ অধিকতর প্রবল। কিন্তু মনুষ্য জীবনে এই কোমল বা কঠোর কোনও শ্রেণীর কর্ত্তব্যই উপেক্ষণীয় বা সচরাচর পরিত্যাজ্য নহে।

আদর্শের বিভিন্নতা মূলেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কর্ম্মক্ষেত্রের সৃষ্টি

বিধাতার সৃষ্টিরহস্যমূলে এই যে নারী ও পুরুষের মধ্যে আকার-মূলক ও অধিকারগত একটা পার্থক্য দৃষ্ট হয়, ইহারই ইঙ্গিৎ গ্রহণ করিয়া আমাদের দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন হিন্দুশাস্ত্রবেত্তাগণ নারীর কর্ম্মক্ষেত্র ও পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে কোথায়ও কোথায়ও কয়টা ভেদ-রেখার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন; বিচার করিয়া, নারীর অনুকূল ক্ষেত্রসমূহকে নারীর ক্ষেত্ররূপে এবং পুরুষের অনুকূল ক্ষেত্রসমূহকে পুরুষেরই কর্ম্মক্ষেত্ররূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ফলে জগতের কোমল দিকটার যাবতীয় প্রধান প্রধান দায়ীত্বগুলি নারীর স্কন্ধে ও কঠোর শ্রেণীর যাবতীয় বিশেষ বিশেষ কার্য্য-গুলির ভার পুরুষদিগের স্কন্ধে আসিয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু কর্ম্মের মর্য্যাদা সর্ব্বত্রই সমান

কিন্তু এই কোমলভাব ও কঠোরভাব নিবন্ধন এই দুইশ্রেণীর কর্ম্মক্ষেত্র-গুলিতে কোথায়ও যে কিছু গুরুত্বের বা গৌরবের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়াছে, এ কথা মনে করা ভুল। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বোঝা যাইবে, নারী বা পুরুষ, কাহারই কর্ম্মক্ষেত্র এজগতে কিছুমাত্র অগৌরবের বা নিন্দনীয় নহে। অথচ এই ভাবটাই মনে পোষণ করিয়া অনেকেই কিন্তু আমাদের আজকাল সমাজে একটু তাল পাকাইয়া তুলিতেছেন, বেশ দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বেও একথার কিছু আভাষ দেওয়া হইয়াছে। আজকাল অনেকেই মনে করিতেছেন, হিন্দুশাস্ত্রবেত্তাগণ এইভাবে কেবলমাত্র কোমল

শ্রেণীর কার্য্যভারগুলিই নারীর জন্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া তাহাদের উপর বড়ই অবিচার করিয়াছেন এবং ইহারই ফলে, হিন্দুসমাজে নারীগণের মধ্যে আজ এত দুর্গতি, আজ তাহারা এত অসহায়, অবলা ও অমানুষ। তাহাদের এই মনোভাবের ফলেই, হিন্দুনারীর এই প্রাচীন আদর্শটা বর্ত্তমানে আবার ঢালিয়া সাজিবার ও নূতন করিয়া গড়াইবার প্রয়োজন পড়িয়াছে বলিয়া চারিদিকে একটা কোলাহলেরও সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

মূল লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া সুযোগসুবিধা অনুযায়ী পথ বদলাইলে ক্ষতি নাই

আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময়ে যে আমাদের আচার-ব্যবহারগুলিতেও পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা আসিয়া পড়ে—একথা আমরা অস্বীকার করি না। একই লক্ষ্যের অনুসরণকল্পে কালে কালে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার কর্ম্মের বা কর্ম্মপদ্ধতির সত্যই প্রয়োজন হয়, আমাদের শাস্ত্রবেত্তাগণও একথা জানিতেন এবং মানিতেন বলিয়াই যুগে যুগে তাঁহারাও তাঁহাদের শাস্ত্র-বাণীগুলির মধ্যেও অনেক অদলবদল ও সংস্কারকার্য্য চালাইয়া গিয়াছেন, দেখা যায়। যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত, একথা তাঁহাদের অজ্ঞাত নহে। কিন্তু নানালক্ষ্যমুখী তাঁহাদের এই সকল পন্থাগুলির কথা এক, আর তাঁহাদের মূললক্ষ্যগুলির কথা স্বতন্ত্র। অবস্থা-বিশেষে রাস্তা অদলবদল করিয়া একই লক্ষ্যের দিকে চ[illegible] এক কথা, আর লক্ষ্য ছাড়াইয়া কোনও ভিন্নলক্ষ্যে ভিন্ন পন্থায় চলা অন্যকথা। যদি এমন ঘটিয়া থাকে যে, আমাদের মূল 'নারীর আদর্শটী' সম্বন্ধে তেমন কোথায়ও কিছু বিবাদ-বিসম্বাদ নাই, কেবল অবস্থাবিশেষে আমাদের ঐ আদর্শমুখী বর্ত্তমান কর্ম্মধারাগুলিকেই পরিবর্ত্তন করিয়া লইবার আবশ্যকতা হইয়াছে,

বোধ হয় বিষয়টী যথেষ্টই সরল ও যুক্তিমূলক হইয়া আইসে। আমাদের বর্ত্তমান ব্যবস্থাগুলি যে নারীর পক্ষে ঐ লক্ষ্যমূলে যাইয়া পৌছিবার পরিপন্থী, শুধু এইটুকু প্রমাণ করিতে পারিলেই বিবাদের অবসান হয়।

হিন্দু আদর্শের সুদৃঢ় ভিত্তি

কিন্তু যদি বিবাদটা মূলতঃ ওই গন্তব্য পন্থাগুলি লইয়াই না হয়, পক্ষান্তরে ওই মূল-আদশটীর সম্পর্কেই উপস্থিত হইয়া থাকে এবং উহাকেই পরিবর্ত্তন করার আবশ্যকতা আছে বলিয়া বিবেচিত হয়, মনে হয়, এ দাবীটী গুরুতর এবং এ দাবী উথাপনের পূর্ব্বে, হিন্দুশাস্ত্র বেত্তাগণ যেসব অকাট্য যুক্তি ও দূরদর্শিতামূলে এই আদর্শটী স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, সদ্‌যুক্তি প্রয়োগে তাহাদেরও খণ্ডন করা আবশ্যক।

যতদূর আমরা অবগত আছি, হিন্দুশাস্ত্রাচার্য্যগণের এই সব অকাট্য যুক্তি ও সুবিন্যস্ত সিদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধে বর্ত্তমান আপত্তিকারীরা তেমন কোনও সদ্‌যুক্তি বা প্রমাণাদির প্রয়োগ এখন পর্য্যন্তও করিয়া উঠিতে পারেন নাই। "সংসারক্ষেত্রে নারীর অধিকার ও লক্ষ্য সর্ব্বত্রই এক, কোথায়ও কোনও প্রকারেই বিভিন্ন বা স্বতন্ত্র নয়"—একথা যাঁহারা বলিতে চান, তাঁহাদিগকে আমরা বলি, এ কথার বিরুদ্ধে শুধু আমাদেরই নয়, স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তারও যে কয়েকটা প্রবল আপত্তিসূচক অকাট্য ইঙ্গিং আছে, উহাদের উত্তরে তাঁহারা কি বলিতে চান, এবং কি ভাবেই বা উহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলা যাইতে পারে?

মাতৃত্বের দায় বড় দায়—এ দায় শুধু নারীর, পুরুষের নয়

জগতের সৃষ্টিকার্য্যের যে অংশটুকু বিধাতা মানুষের ওপরে ফেলিয়াছেন, স্পষ্ট দেখা যায় মাতৃরূপা নারীর উপরেই উহার বেশী ভাগ অর্পিত। শুধু

যে তাহাকে তিনি এজন্য সন্তান গর্ভে ধরিবার একটা বিশেষ ও একচেটিয়া অধিকার দিয়াই এ জগতে পাঠাইয়াছেন তাহা নয়, এই সন্তানকে আশৈশব রক্ষা ও প্রতিপালন করিবার মত যেসব কোমল মনোবৃত্তি ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন তাহাও তাহাকে বিশেষ ভাবেই দিয়া দিয়াছেন, কিন্তু পুরুষজাতিকে এসব দেন নাই। ইচ্ছা করিয়াও পুরুষ কখনও নারীকে এসব অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে বা নারীর এই বিশেষ অধিকারগুলিতে ভাগ বসাইতে পারিবে, এমত মনে হয় না। তাহার নারীর সহিত সমধিকারের দাবীটা এইখানেই পণ্ড হইয়া যায়। ভগবানের এই একটা মূল-নির্দ্দেশের অনুসরণ ক্রমেই যে বাধ্য হইয়া মানুষকে নারীর জীবনযাত্রা-পদ্ধতিটাকে আগাগোড়াই পুরুষের আদর্শ হইতে এই প্রকার একটু স্বতন্ত্র ছাঁচে ঢালিয়া লইতে হইয়াছে—একটু মনোনিবেশ করিয়া দেখিলেই একথাটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাইবে। মানুষ কোনও প্রকার খেয়াল বশতঃ বা দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ এরূপ করিয়াছে—এ অভিযোগ অমূলক।

একদায়ে বহুদায়ের সৃষ্টি, পুরুষের হিসাব নাই

নারীকে মাতা হইবার জন্য অনুজ্ঞা দিয়া যে মুহূর্ত্তে ভগবান এই সংসারে তাহাকে পাঠাইলেন, সেই মুহূর্ত্তে বাধ্য হইয়া তাহাকে পুরুষের ধারা হইতে একটা স্বতন্ত্র জীবনধারাও নিজের জন্য বাছিয়া লইতে হইল। এই মাতৃত্বকে ঠেলিয়া ফেলিবার উপায় নাই। কিন্তু এভার বহিতে গেলে কেবলমাত্র ওই সন্তানপ্রসবের সঙ্গে সঙ্গেই সকল দায়ের নিবৃত্তি নয়, পরন্তু ইহার প্রয়োজনে ও দায়ে আরও কত কিছুর দায়ীত্বই না সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ঘাড়ে করিয়া লইতে হইয়াছে। মাতা তো হইতে হইবে, কিন্তু এই মাতা হওয়ার জন্যই আবার তাহার

বিবাহ করারও প্রয়োজন, রীতিমত ঘর-সংসার করার দরকার, পতির সহিত মন-প্রাণে এক হওয়ার আবশ্যকতা, এবং আরও, পুত্র-কন্যাকে সর্ব্বদা সতর্কতার সহিত ও স্নেহ-মমতায় লালন-পালন করাও কর্ত্তব্য। মাতৃত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য ভগবান যে কতকগুলি কোমল মনোবৃত্তি ও একটী মমতাপূর্ণ হৃদয় তাহাকে দিয়া দিয়াছেন, উহাদেরই পীড়নে শুধু সন্তানের শৈশবকালীন রক্ষণাবেক্ষণই নয়, এইসব সমস্তই তাহাকে করিতে হয়, আর বিবাহ হইতে মৃত্যুর তারিখটী পর্য্যন্ত ওই একটী বিশেষ জীবনধারায়ই জীবনকে চির-উৎসর্গিত করিয়া রাখিতে হয়। এ দায় কম নহে। পুরুষের আস্পর্দ্ধা, না বুঝিয়া-শুনিয়া সে তাহার নিজের কর্ম্মক্ষেত্রটাকেই এত বড় করিয়া দেখে! মনে করে, কোণ্‌ঠাসা গৃহাবদ্ধা নারী—তাহাদের ভাগাভাগির জীবনে, জীবন-সংগ্রামের আবর্ত্তে—কোন সহায়তাই সে করে না। কৃপা করিয়া অনেক পুরুষ বলে, "ব্যর্থ তোমাদের জীবন, একান্তই তোমরা আমাদের গলগ্রহ; এস, বাহিরে চলিয়া এস; কতকাল আর আমাদের ওপর এইভাবে তোমরা ভার হইয়া রহিবে—একটুও কি আত্মসম্মানবোধ নাই? আমাদের সঙ্গে আসিয়া আমাদের মতই নড়িয়া চড়িয়া কোলাহল করিয়া সকল কার্য্য কর, জীবন সার্থক কর। দেখ, শুধু তোমাদের জন্যই আজ আমরা এত পঙ্গু হইয়া রহিয়াছি, বিশ্বের দরবারে কল্কে নাই না।" বড় দুঃখ, এ স্পর্দ্ধার জবাবে নারী তাহার নিজের গর্ব্বের কথাগুলি এমনই জোরে স্পষ্ট গলায় তাহাকে শুনাইতে পারে না। কহিতে পারে না—"ওগো, তোমরা বীর জানি, কিন্তু প্রকৃত বীরত্ব শুধু ঐ মাংসপেশী বা কণ্ঠের বাক্যাবলিতেই সীমাবদ্ধ নয়! ভোগের বীরত্ব—অতি তুচ্ছ। ত্যাগের বীরত্ব দেখিতে চাও তো আমাদের নিকটে এস। জগতের অনেক কাজ তোমরা কর, কিন্তু আমাদের মত বড়-বড় দায়ীত্বপূর্ণ কাজ কয়টা করিতে পার, বলিতে পার? স্বামী হইতে পার, ভাই সাজিতে পার, পিতা-পুত্রও

সাজিতে পার, কিন্তু আমাদের মত মাতৃত্বের বা সহধর্ম্মিণীত্বের দায়ীত্ব লইবার শক্তি তোমাদের কই? তোমাদের কোনও অধিকার, কোনও শক্তিইতো এত মহৎ নয়। যে-বিষ জগতে আর কেহ হজম করিতে পারিল না, সেই বিষই কিনা আমরা গলায় লইয়াছি, তুচ্ছ অমৃতভাণ্ডটা তোমাদিগকেই ছাড়িয়া দিয়াছি। ত্যাগের এত বড় ক্ষমতা আমাদিগকেই ভগবান দিয়াছেন, তোমাদিগকে নয়। তবে এত গর্ব্ব কিসের শুনি?"

মাতৃত্বই নারীর আদর্শের বা কর্ম্মক্ষেত্রের মাপকাঠি, সুতরাং পুরুষ হইতে তা'র কর্ম্মক্ষেত্রও স্বতন্ত্র

পুরুষ এ জবাবের কি প্রত্যুত্তর দিতে পারে জানি না, কিন্তু আমরা খুঁজিয়া পাই না। বস্তুতঃ এই মাতৃত্বের মত গুরুতর, মহৎ ও বহুদায়ীত্বপূর্ণ ভার এ জগতে বুঝি আর নাই। আর সত্য সত্য এ ভার স্কন্ধে লইয়া নারীই একমাত্র জগতকে উহার সৃষ্টির দায়ীত্বের একটা বিরাট অংশ হইতে অব্যাহতি দিয়াছে। পুরুষ অনেক কিছু করিতে পারে বটে, কিন্তু নারীর এতবড় কর্ত্তব্যের মত একটা কর্ত্তব্যও তাহার নিজের অধিকারে কোনও আকারে কোনও দিন সে পায় নাই। তাহার নিজের জন্যই হউক বা সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই হউক, জগতের এত বড় মঙ্গল ও কল্যাণের একটা কার্য্যও নিজে করিয়া সে কখনও ধন্য হইবার সুযোগ পাইবে, সে আশা বিড়ম্বনা। পুরুষ ভগ্নীর স্থলে ভাই সাজিয়া, কন্যার স্থলে পুত্র সাজিয়া, আর একান্ত বলিতে হয় ত বল, পত্নীর স্থলে স্বামী সাজিয়াও নারীর প্রতিযোগিতা করিবার কিছু সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার হয় ত পায়, কিন্তু মাতৃত্বের দায়ীত্ব লইবার মত কোনও অধিকার, সুযোগ-সুবিধা বা সামর্থ্য তাহার ভাগ্যে জুটে না। নারীকে সচরাচর বিশেষ করিয়া 'মায়ের জাতি' বলিয়া আমরা যে একটা বিশিষ্ট সম্ভ্রমের ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি দেই, উহার

নিগূঢ় রহস্যও এইখানে। নারীকে অপর আর যাহাই আমরা করিতে বলি না কেন, এমন কিছু করিবার জন্য যেন কখনও আহ্বান না করি, যাহা করিতে গেলে এই মাতৃত্বের দায়ীত্বটার প্রতি কোনও ভাবে তাহাকে দৃষ্টিশূন্য বা উদাসীন হইতে হইবে। বাস্তবিক, হিন্দুনারীর আদর্শের এই মাতৃত্বটাই সর্ব্বপ্রধান মাপকাঠি। আমাদের অন্তঃপুর-প্রথা বল, অবরোধ-প্রথা বল বা নারীর অপর যা-কিছু অভাব-অভিযোগ বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ের উল্লেখ কর—উহাদের প্রয়োজনীয়তা বা অপ্রয়োজনীয়তার কথাটা এই মাপকাঠির সহায়তায়ই ধরা পড়িবে। এ মাপকাঠিতে ধরা না পড়ে তো, হিন্দুনারীর আদর্শের হিসাবে উহারা তেমন ভাবে আবশ্যকীয় নয়। উহাদের অভাবে আর যাহা হউক, এই আদর্শটার গায় আঁচর লাগিবে না। কিন্তু এই মাতৃত্বের দায় রক্ষা করিবার জন্য, কোনও বস্তু-বিশেষের বা দেশাচার-বিশেষের প্রয়োজনীয়তা সকল সময়েই যে ঠিক একই রূপ থাকে, তাহাও নয়। এমন কি, কাল-মাহাত্ম্যে বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার গুণে অনেক সময়ে সেরূপ অনেক জিনিষের প্রয়োজনীয়তা একবারেই হয়ত অদৃশ্য হইয়া যায়, আবার হয়ত অনেক নূতন জিনিষের প্রয়োজনীয়তাও নূতন করিয়া আইসে। কিন্তু এরূপ সব ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা বলা যায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত যে'টার যাহার যেমন প্রয়োজনীয়তা থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্তই সেইটাকে সেই পরিমাণে আদর্শের অধিকারভুক্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে। আমাদের এই অবরোধ-প্রথাটা লইয়াই এস্থলে এই বিষয়টার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। এই অবরোধ-প্রথাটা গোড়াগুড়ি হইতেই আমাদের মধ্যে ছিল কিনা—সেটা একটা সন্দেহের ও তর্কের বিষয়।

কিন্তু সে-কথা যাক্। আপাততঃ আমরা দেখিতে পাই যে, যদিও এই অবরোধ-প্রথাটা হিন্দুসমাজের অনেক জায়গায়ই প্রবর্ত্তিত বটে,

তথাপি কোথায়ও কোথায়ও এ প্রথাটা বহুলাংশে উঠিয়াও গিয়াছে। আবার বোম্বাই, মালাবার ও মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে ইহাদের আধিপত্য প্রায় দৃষ্ট হয় না। এই সব বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন অবস্থায় এ সম্বন্ধে আমাদের তবে কর্ত্তব্যটা কিরূপ? আমাদের নীতির মূলতত্ত্বটা এই অবস্থাটীকে অবলম্বন করিয়াই বেশ বিশ্লেষণ করা যাইবে। অবরোধ-প্রথা কোথায়ও থাকুক বা না থাকুক, আমরা শুধু এই লক্ষ্য রাখিতে চাই যে, যে-ক্ষেত্রটী লইয়া বিচার উপস্থিত, সেই বিশেষ ক্ষেত্রটীতে সত্য সত্য মাতৃত্বের পরিপুষ্টিকল্পে ঐ অবরোধ-প্রথাটীর কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা? যদি থাকিয়া থাকে, তবে সে-ক্ষেত্রটীতে আপাততঃ উহা থাক্ বা না থাক্, উহাকে রক্ষা করিতেই হইবে। পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান থাকিলে কখনও উহাকে তুলিয়া দিব না, আর না থাকিলে, নূতন করিয়া বরং যথাসাধ্য উহার প্রবর্ত্তন করিব; তাহাতে অপরদিকে একটু-আধটু অসুবিধা ঘটিলেও ক্ষতি নাই। মাতৃত্বের উপরে এ সংসারে আর কিছুরই বেশী দাবী-দাওয়া নাই বা হইতেও পারে না।

এইক্ষণ, এই মাতৃত্বের প্রয়োজনীয়তাটা সত্যসত্য হিন্দুনারীর কর্ম্ম-ক্ষেত্রটীকে কতদূর পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে পারে, তাহাই দেখা যাক্। শুধু সন্তানপ্রসবার্থে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু পর্য্যন্ত লইয়াই যদি মাতৃত্বের আবশ্যকতার গণ্ডীটাকে সীমাবদ্ধ করি, তবে এ মাতৃত্বের গৌরব বা সার্থকতা আমাদের নিকট বড় বেশী থাকে না। নানা ইতরজীবের মধ্যেও এই স্ত্রীজাতিরাই সন্তান প্রসব করে দেখি, কিন্তু ... উহাদের মধ্যে এই মা হওয়ার গৌরব কতখানি দেখিতে পাই? সুতরাং এই মাতৃত্বটা মনুষ্যজাতির পক্ষে অবশ্যই আরও অনেক বেশী গুরুতর, মনুষ্যজাতির পক্ষে ইহার প্রয়োজনীয়তাও অবশ্য এই সন্তানপ্রসবের গণ্ডীর বাহিরেও বহুদূর-প্রসারিত। নারীর মাতৃত্ব শুধু সন্তানপ্রসব মাত্রেই

পর্য্যবসিত হইতে পারে না। সন্তানপ্রসবান্তে সেই সন্তানের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কল্যাণার্থে যতদিকে যাহা-কিছু প্রয়োজন, এই মাতৃত্বের সার্থকতা পূর্ণভাবে লাভ করার নিমিত্ত সে সকলকেও অবশ্যই আয়ত্ত করিতে হইবে।

সময় ও অবস্থা বিশেষে সামাজিক ব্যবস্থার তারতম্য

হিন্দুসমাজে নারীর কর্ম্মক্ষেত্র যে দিকে-দিকে পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র-গুলি হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে, উহার রহস্যও এইখানেই। এই মাতৃত্বের দায়টী শুধু নারীরই আছে, পুরুষের নাই। পরন্তু, পুরুষের নিজের আবার এমন কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে, যাহা শুধু পুরুষেরাই সুচারুরূপে করিতে পারে, নারী সে-সব ক্ষেত্রে পঙ্গু। ভগবান-প্রদত্ত তাহার দুর্ব্বল দেহ ও কোমল মনটী লইয়া বাধ্য হইয়া তাহাকে সে-সব ক্ষেত্রের ভার পুরুষদিগের উপরেই একান্তভাবে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া পড়িতে হয়। সাম্য কোথা হইতে আসিবে? কর্ম্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান ভাব, সমান অধিকার কিভাবে স্থাপিত হইবে? কামারের কাজে কুমরকে ডাকিলে, বা কুমরের কাজে কামারকে ডাকিয়া আনিলে কি সার্থকতা ঘটে? এই ব্যর্থতার ভাবটাই বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তবেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ, তাৎকালীন অবস্থাবিবেচনায়, আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রগুলির মধ্যেও কোথাও কোথাও স্ত্রী-পুরুষ-ভেদে স্বাতন্ত্র্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অবস্থাপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কালে কালে আবশ্যক মত এসব ব্যবস্থায় পুনঃ কিছু কিছু পরিবর্ত্তনও করিয়াছেন, কিন্তু কখনও ঐ মূল লক্ষ্যটীকে দৃষ্টির অন্তরাল করেন নাই। ঐ মূল-লক্ষ্যটা বজায় রাখিয়া বা বজায় রাখিবার জন্যই, পারিবার্ষিক অবস্থা-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেদিকে যখন যেটুকু যোগ, বিয়োগ, বা অদল-

বদলের সুযোগ-সুবিধা বা আবশ্যকতা বুঝিয়াছেন, সেই পরিমাণেই উহাদিগকে গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনানুরূপ সংস্কার-কার্য্য করিয়াছেন। এবং এরূপ সংস্কার-কার্য্যেই সমাজের পুষ্টি। স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের যোগ্যতা ও লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, প্রত্যেক অবস্থান্তরে যথাসাধ্য নারীদিগকে সর্ব্বপ্রকার কাজ-কর্ম্মের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিলে সমাজের উহাতে মঙ্গল ও কল্যাণই সাধিত হইয়া থাকে।

এইজন্য, অবস্থান্তরঘটিত এইপ্রকার সাময়িক সংস্কারের আবশ্যকতাও যে কখন কখন অনিবার্য্য—একথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু কোনও অবস্থান্তরেই ঐ মূল-লক্ষ্যগুলিকে ছাড়িলেও চলিবে না। মাতৃত্বের গৌরব সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা আমাদিগকে করিতেই হইবে; আর কামারের কার্য্য কুমরের উপর দিয়া বা কুমরের কার্য্য কামারের ঘাড়ে চাপাইয়া অন্যান্য দিকেও গোলযোগ না করিয়া ফেলি, সেদিকেও সকলের দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এই মূললক্ষ্য দুইটীকে স্থির রাখিয়া অবস্থাভেদে যাহা-কিছু পরিবর্ত্তন করা সম্ভব, উহা করাই যথার্থ কর্ত্তব্য। আমাদের বর্ত্তমান নারীর আদর্শটীকেও এই নীতি অনুযায়ীই আমাদিগকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ওই দুইটী মূললক্ষ্যকে স্থির রাখিয়া অবস্থান্তরজনিত পরিবর্ত্তন যতদূর সাধ্য, অবশ্যই আমরা করিব। এইক্ষণ এই নারীর আদর্শটা আমাদের বর্ত্তমান যুগে এই মাপকাঠির হিসাবে কিরূপ দাঁড়ায়—বিচার করা যাক্।

আদর্শ-প্রতিষ্ঠাকল্পে বর্ত্তমান প্রয়োজনীয়তা

আমাদের মনে হয়, মাতৃত্বের গৌরবটাকে পূর্ণসাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে, নারীর পক্ষে আজও পর্য্যন্ত এইগুলির দরকার:— বিবাহ, পাতিব্রত্য, সন্তান-প্রতিপালনার্থে ও শিশুরক্ষাকল্পে উপযুক্ত

জ্ঞান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, শুচিতা, সুপরিচালিত গৃহস্থালী, নানা মাঙ্গলিক গৃহানুষ্ঠান, সন্তানের শিক্ষা ও চরিত্রগঠনের অনুকূল অপর যাবতীয় ব্যবস্থা ইত্যাদি। কিন্তু এইগুলি লইয়াই যে নারীর একমাত্র কর্ম্মক্ষেত্র—এমন কথা আমরা কহিতেছি না। আমরা যাহা কহিতেছি তাহা এই যে, নারীর মূল-লক্ষ্য স্থির-রাখা কল্পে এইগুলির আবশ্যকতা একান্তই অপরিহার্য্য। সংসারে অপর কর্ত্তব্যও আরও আছে সত্য, এবং উহাও নারী করিবে কিন্তু কোন অবস্থায়ই এই-গুলিকে ছাড়িয়া বা অগ্রাহ্য করিয়া নয়। এইগুলিকে অবহেলা করিয়া কিছুই সে করিবে না; করিলে অবশ্যই নারীর আদর্শের মর্য্যাদাক্ষুণ্ণ হইবে, এবং তাহার যথার্থ উন্নতির পথও কিছু-না-কিছু কণ্টকাকীর্ণ হইবেই।

কিন্তু ঐগুলির প্রত্যেকটীকে আয়ত্ত করিবার জন্যই আবার নারীকে আনুসঙ্গিকভাবেও অপর অনেক কার্য্য করিতে হয়। সংক্ষিপ্তভাবে যথাসম্ভব সেই সকলের উল্লেখ করাও এই গ্রন্থের অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু তদ্‌পূর্ব্বে অপর কয়টী আবশ্যকীয় কথাও যথাসম্ভব আমরা বলিয়া লইতে চাই।

বিরুদ্ধবাদীদের প্রত্যুত্তর কি?

এপর্য্যন্ত আমরা যেসব মতবাদ প্রচার করিলাম, উহাদের বিরুদ্ধাত্মক কথাও আজকাল অনেক শ্রুত হয় বটে। পূর্ব্বেও একথার আভাষ দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ করিয়া নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেই এইরূপ বিরুদ্ধবাদী দলের প্রাচুর্য্য অধিক। অনেক গণ্যমান্য নেতা ও মনস্বী ব্যক্তিদের মুখেও এইজাতীয় বিরুদ্ধবাদ আজকাল অনেক শোনা যায়। তাঁহারা বলেন, বস্তুতঃ নারী ও পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে সত্যসত্য গুরুতর প্রভেদ তেমন কিছু নাই। জগতের যে-কোনও

কর্ম্মক্ষেত্রে নারীর দাবী ও পুরুষের দাবী বস্তুতঃ সমান। পুরুষেরাই স্বার্থপরতা বশতঃ কতকগুলি অলীক শাস্ত্রবাণী ও মিথ্যা যুক্তি রচনা করিয়া নানাছলে নারীজাতির স্বাধীনতাকে অনেক ক্ষেত্র হইতে বিদূরিত করিয়াছেন এবং এজন্যই নারী আজ এত পঙ্গু ও অসহায় হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহাদের এশ্রেণীর কথার জবাবে আমাদের যাহা যুক্তি ও বক্তব্য আছে, এপর্য্যন্ত যথাসাধ্য বলিয়াছি। অতঃপর এবিষয়ে তাঁহাদের আর কি বলিবার আছে, তাঁহারা যদি একটু স্পষ্ট ভাষায় আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন—পরমবাধিত হইব। আমাদের আত্মপক্ষসমর্থনের নিমিত্ত শুধু আমাদের এই এক-তরফা নিজস্ব কথাগুলিই প্রচুর নয়—বিরুদ্ধ পক্ষের মতবাদ-খণ্ডনেরও যে একটা প্রকাণ্ড আবশ্যকতা রহিয়াছে, তাহাও আমরা বুঝি; এবং এজন্যই এই অনুরোধ উপস্থিত করিতেছি। এপর্য্যন্ত এই সকল বিরুদ্ধবাদ সম্বন্ধে আমাদের যেটুকু অবগতি ও অভিজ্ঞতা আছে, পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উহাদেরই মোটামুটি উল্লেখ করিয়া তৎসম্বন্ধে আমাদের আর যাহা যাহা বক্তব্য আছে, অল্পাধিক উহাদের উল্লেখ করিতেও প্রয়াস পাইব।

নবযুগের সমস্যা

অনেক সংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শনম্।
সর্ব্বস্য লোচনং জ্ঞানং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ॥

চাণক্য শ্লোক।

যে-জ্ঞান বহুসংশয় উচ্ছেদ করিয়া অপ্রত্যক্ষকেও দৃষ্টিপথবর্ত্তী করে সেই সর্ব্বলোচন-জ্ঞান যাহার নাই, সে-ই প্রকৃত অন্ধ।

নারীর কর্ম্ম-যোগ

নবযুগের সমস্যা

সমস্যা কোথা হইতে আইসে

আমাদের মনে হয়, আমাদের নারীর আদর্শটা লইয়া ইদানীং যাহা-কিছু গোলযোগ চলিয়াছে, তাহার জন্য আংশিকভাবে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা ও আংশিকভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবটাই দায়ী।

পরাধীন জাতির বিপদ

পরাধীন জাতির একটা বিপদ এই যে, তাহার নিজের গৌরবের বস্তুগুলি ক্রমে সে ভুলিয়া ফেলে। তারপর তাহার দ্বিতীয় বিপদ এই যে, ক্রমে নিজের বস্তু হইতে তুলিয়া লওয়া তার সেই শ্রদ্ধা প্রভুর ঝুটা-মেকী সকল প্রকার তুচ্ছ সম্পদের ওপরে অনায়াসেই সে ঢালিয়া দেয়। কি আচার-ব্যবহারে, কি পোষাক-পরিচ্ছদে, কি শিক্ষা-দীক্ষাতে, আবশ্যকে ও অনাবশ্যকে, সর্ব্বত্রই উহাদের অনুকরণ করিয়া চলিতে সে বাধ্য বা অনুরক্ত হয়।

আমাদের এদেশ সম্পর্কেও একথাটা অনেকখানিই সত্য। যেমনই আমরা একদিকে আমাদের প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা ও আদর্শ-গুলিকে ক্রমে ভুলিয়া ও হারাইয়া ফেলিতেছি, তেমনই আবার পক্ষান্তরে অপরের সাচ্চা-ঝুটা সকল প্রকার সম্পদের ওপরেই আমাদের ভক্তির বহরটাও নির্ব্বিচারে অত্যন্ত বিস্তৃত করিয়া তুলিতেছি।

পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ, এমন কি তাঁহাদের এতদ্দেশীয় ছাত্র-শিষ্যগণও, আজ আমাদের হিসাবে আমাদের প্রাচীন মুনি-ঋষিগণ

অপেক্ষাও অনেক বড়। আমাদের মুনি-ঋষিগণের শিক্ষা-দীক্ষা, সাধনা, দূরদর্শিতা, এমন কি—তাঁহাদের সততাটুকুকেও আজ আমরা বড় সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছি। সেকালের অনেক ব্যবস্থা কালবশে একালে কিছুটা অচল হয়ত হইয়াছে—একথা স্বীকার করি, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা যে সাধক ছিলেন না, জ্ঞানী ছিলেন না, কুমৎলবী বা স্বার্থপর ছিলেন—এ ধারণা আমাদের কোথা হইতে আসিল ?

প্রাচীনের প্রতি অশ্রদ্ধা

বলিতে হইবে, পরাধীনতা বশতঃ আমাদের নিজস্ব প্রাচীন শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতার প্রতি অনেকাংশে আমরা শ্রদ্ধাহীন, বিচার-শূন্য ও উদাসীন হইয়াছি বলিয়াই এইভাবটী ক্রমে আসিয়া আজ আমাদিগকে এইভাবে পাইয়া বসিয়াছে। এই অশ্রদ্ধা ও ঔদাসীন্য বশতঃই প্রাচ্য বিদ্যা ও সভ্যতার যথার্থ আলোচনা ও চর্চ্চা আমাদের দেশ হইতে আজ প্রায় দূরীভূত হইয়াছে এবং এই চর্চ্চার অভাবে উহাদের সম্বন্ধে নানা অমূলক ভ্রান্ত ধারণাও আজ আমাদিগকে আসিয়া সহজেই আক্রমণ করিয়াছে। অজ্ঞানতার প্রভাবে আমাদের বিচার-শক্তিটীও ক্রমেই পঙ্গু হইয়া পড়িতেছে।

আমাদের সাক্ষী

আমাদের এ কথাটা সত্য কি মিথ্যা—উহার সাক্ষী ইতিহাস। যতদিন পর্য্যন্ত না এদেশে পাশ্চাত্যবিদ্যার প্রভাব আসিয়াছিল, ততদিন পর্য্যন্ত প্রাচ্যসভ্যতা বা প্রাচ্যবিদ্যার প্রতি আমাদের এতটা [illegible]রূপভাবের সৃষ্টি হয় নাই। ততদিন প্রাচ্য ঋষিদের সত্যজ্ঞান ও [illegible]বের দাবীতে কেহ আমরা অজ্ঞতাবশতঃ এত বাধা জন্মাইতে অগ্রসর হই নাই। "সত্যজ্ঞান ও গৌরবের" কথা এই জন্য বলিলাম যে, যাহা প্রাচীন,

উহাই যে সত্য বা গৌরবের বস্তু হইবে—এমন অসার কথাকে আমরাও মনে স্থান দেই না, বা এমনও কহিতে চাই না যে, আমাদের প্রাচীন জ্ঞানসম্ভারের মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহা মাত্র সাময়িক হিসাবেই তখন সত্য ছিল বা যাহাকে আজপর্য্যন্ত জাল, মেকী বা প্রক্ষিপ্ত সামগ্রী বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষা মাত্রই সত্য নয়, তাহা জানি; প্রাচীন অনেক বস্তুতে অনেক ভেজাল ও আবর্জ্জনাও যে জুটিয়াছে,—উহাও স্বীকার্য্য; এবং নানা কুসংস্কারবশতঃ দেশের লোক প্রাচীন অনেক কিছুরই সত্যব্যাখ্যা করিতে বহুকাল হইতেই অক্ষম—সে কথাও অমান্য নয়; কিন্তু তথাপি এসত্যও অস্বীকার করা যায় না যে, ঐসব ভেজাল, আবর্জ্জনা ও কুসংস্কারগুলির অন্তরালেই আবার এমন নিশ্চিত বিরাট সত্যবস্তুও অনেক ছিল বা এখনও আছে, যাহা সত্যসত্যই অমূল্য ও অতুলনীয়, এবং যাহাকে আজ আমরা শুধু এই পাশ্চাত্যশিক্ষাজনিত আত্ম-অবজ্ঞা বশতঃই হারাইয়া ফেলিতে বসিয়াছি।

দায়ী কে? নব্য শিক্ষা

মানুষের সংস্কার শিক্ষারই হাত-ধরা। পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে এত কাল যে-শিক্ষা আমরা পাইয়া আসিতেছি, উহার ভিতরে আমাদের সমাজ বা প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষার কথা লইয়া বড় বেশী কিছু পাওয়া যায় না। বরং উহাদের বিরুদ্ধভাবাপন্ন অনেক কথাই উহার ভিতরে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। একদিকে ইহাদের প্রভাব, এবং অন্যদিকে ওই আত্ম-বিষয়ক অজ্ঞতা আমাদের অনেকের ভিতর আজ এই একটা অভিনব সংস্কারই আনিয়া দিয়াছে যে, প্রাচীন হিন্দুসভ্যতা ও হিন্দু-ধর্ম্মের অনুশাসনগুলি বর্ত্তমান যুগে অচল, নানাভাবে বিকৃত হইয়া আজকাল উহারা আমাদের প্রকৃত উন্নতির পথে সত্যসত্যই পরিপন্থী

হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অভিনব সংস্কারমূলে আজকাল আমরা আরও এইরূপ ভাবিতে সুরু করিয়াছি যে, এই বাহ্যিক জগৎ ও এই আমাদের ক্ষণভঙ্গুর জীবনটাই সর্ব্বস্ব এবং আমাদের যাহা-কিছু সুখ-দুঃখ বা উন্নতি ও অবনতি—উহারাও একমাত্র উহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

একান্ত ঐহিকভাবের বিপদ—নবীনের ভ্রান্তি

বর্ত্তমান যুগের এই একান্ত ঐহিকভাবটাও দিনে দিনে আমাদের মধ্যে কম বিচারশক্তির অভাব আনিয়া দেয় নাই। এই সর্ব্বনেশে ভাবটার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্তপ্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বিগত ১৩৩৮ বাং সনের শ্রাবণ, ভাদ্র ও কার্ত্তিক মাসের সংখ্যার 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় যে তিনটী মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, উহাদের ভিতর হইতে এইখানে কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিয়া দিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তর্কভূষণ মহাশয় কহিতেছেন ঃ—

"সভ্যতা বা কাল্‌চার নিজেকে সভ্যতা বা কালচার বলিলেই, তা হইয়া গেল না। আপনার ঢাকটী বাজাইতে কেহ কোনদিন কসুর করে নাই। প্রকৃত সভ্যতা বা কাল্‌চারের নিদান ও লক্ষণ সাব্যস্ত হওয়া দরকার। প্রকৃত উন্নতি বা অভ্যুদয় কি অবস্থায় কোন্ কোন্ উপাদানে গঠিত হইতে পারে, তা আমাদের ধীরভাবে ভাবিয়া দেখা উচিত হইবে। মেকী ও ভেল্কীর বড় বেশী কাট্‌তি হইতেছে দেখিতেছি।"

"আমরা সভ্যতা ও কাল্‌চারের একটা সত্য লক্ষণ নিরূপণ করিতে চাহিতেছি। গোড়ায় কতকগুলি মূল সূত্র স্থির করি[illegible] না লইলে, নিরূপণ যাকে বলে তা হয় না। যদি ভগবান্ না থাকেন, পরলোক না থাকে, এ বিশ্বচক্র ধর্ম্মের শাসনে না চলে, মানুষের অবিনাশী আত্মার কথা বাদ দিয়া তার ভঙ্গুর দেহটার কথা ভাবিলেই যদি চলে, তবে

অবশ্য মানুষের সভ্যতা ও কাল্‌চারের ভিত্তি একভাবে গঠিত হইবে। কিন্তু মানুষের ধর্ম্মবিশ্বাস, অলৌকিক এবং অতীন্দ্রিয়ে বিশ্বাস—এসবে যদি কোন সত্যতা অথবা মূলবত্তা থাকে, তবে আমরা সভ্যতা এবং কাল্‌চার অপর একটা ভিত্তির উপর গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিব। কোন্ ভিত্তিটা সত্য ভিত্তি, কোন্ ভিত্তির উপর সভ্যতার আয়তন গড়িয়া তুলিলে সেটা সত্যকার মঙ্গলের শ্রীনিকেতন হইবে, সেটা এই দারুণ বিষম সমস্যার দিনে নানা বিপ্লবের মুখে আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত হইবে নাকি ?"

সেই "পুরাবিদ্যা—যার অভিজ্ঞান ও পরিচয় এদেশে বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্রে কতকটা পল্লবিত রহিয়াছে—আর নব্যবিদ্যা—যেটা মুখ্যতঃ বিজ্ঞানের নামে নিজেকে চালাইতেছে—এ দুয়ের মাঝখানে একটা সুমেরু-কুমেরুর ব্যবধান দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এটা যদি সত্যসত্যই বিজ্ঞান হয়, তবে সেটা বোধ হয় আর বিজ্ঞান নয়। "বোধ হয়" বলিতেছি এইজন্য যে, হয়ত' হালের বিজ্ঞান বিজ্ঞানের সবটা না হইতে পারে; তার সীমার বাইরেও বিজ্ঞান থাকা সম্ভব, এবং সে বিজ্ঞান চল্‌তি বিজ্ঞানের পছন্দ মাফিক অথবা ফরমাসি একটা কিছু নাও হইতে পারে। মানুষের মামুলি বিশ্বাসের অনেক কিছু এর মধ্যেই বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারের দরজায় জোরে ধাক্কা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। সম্মোহনবিদ্যা, দূরশ্রুতি, দূরদৃষ্টি প্রভৃতি কোন কোন উপেক্ষিত অতিথি আজ স্বাধিকারের দলিলপত্র দেখাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে—নিমন্ত্রণ-পত্রের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে নাই। প্রেত-তত্ত্ব, জন্মান্তরতত্ত্ব, যোগশক্তি প্রভৃতি এখনও হয়ত' বাইরে দাঁড়াইয়া! কিন্তু কৃপাপ্রার্থী হইয়া নয়। * * * এতদিন প্রাচীন ভাব-বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান নবীনের ঔদ্ধত্যের কাছে ঘেঁষিতে পারে নাই। * * আজ নানা কারণে তার ঔদ্ধত্য খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে।"

হাঁ, এ ঔদ্ধত্যটায় কিছু নরম পড়িয়াছে বটে, কিন্তু এখনও নবীন তার গোঁ ছাড়ে নাই। কার্য্যক্ষেত্রে সে এখনও সেই একান্ত সংসার-মুখী বুদ্ধিটীকে অবলম্বন করিয়াই নিশ্চিন্ত মনে চলিয়াছে, ঈশ্বর-মুখী হইয়া, কৈ, কিছুই তো করে না। এই নারীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও অভাব-অভিযোগের বিচারটাও তো আজও সে সেই হিসাবেই করিতেছে!

মানুষ যে শুধু মাত্র এসংসারেরই জীব নয়, তাহার অবিনশ্বর আত্মা যে অনন্তকালস্থায়ী, অনন্ত ভবিষ্যদ্‌জীবনের অধিকারী, দৃশ্য-অদৃশ্য, জানা-অজানা বহুলোকের অবিসম্বাদিত যাত্রী, এবং এইজন্য নারীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, সুখ-দুঃখ ও লক্ষ্যের বিচারটাও যে ঐ হিসাবেই হওয়া প্রয়োজন, কই, এভাবটী তো নবীনের ঐসব মতবাদ-প্রচারের মধ্যে আজও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সে হয়ত মুখে ঈশ্বর অস্বীকার করে না, তাঁর সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বেও প্রতিবাদ উঠায় না, আকাশের শতসহস্র নক্ষত্রাবলীর দিকে চাহিয়াও এমত বলে না যে, ঐগুলি সত্যসত্যই আমাদের এই জগতের মতই অসংখ্য জগৎ নয়, শুধুই কয়েকটা আকাশপ্রদীপ মাত্র, কিন্তু কাজের বেলায় আমরা কি দেখি? আজও তো ইহাই দেখি যে, এই সংসারমুখী লক্ষ্যটাকেই সম্মুখে স্থির রাখিয়া আগাগোড়া সে নিশ্চিন্তগতিতেই চলিয়াছে!

কোনও জিনিষকে সত্যসত্য সম্মুখে উপলব্ধি করিতেছি, অথচ তাহাকে গ্রাহ্য করিব না; পথের সাম্‌নে আগুন জ্বলিতেছে দেখিতেছি, আর আগুনে গা লাগিলে গা পুড়িয়া যায় তাহাও জানি, তবু ঐ আগুনের ওপর পা ফেলিয়াই যাইব—এ কেমন সদ্‌বুদ্ধি?—এ কেমন দূরদর্শিতার পরিচায়ক? কে ইহার সমাধান করিবে

ঈশ্বরমুখী বিদ্যাই প্রকৃত হিতসাধক, প্রাচীনেরাও এই শিক্ষাই দিয়াছেন

এযুগেরই একজন ভাবুক মনস্বী, স্বয়ং বিশ্বপূজ্য রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ, শিক্ষায়-দীক্ষায় ও আভিজাত্যে পরমগরিষ্ঠ স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন—

"সাংসারিক দূরদর্শীমাত্র হইলে তত উপকার দর্শে না যত আমাদিগের ঈশ্বরবিষয়ক দূরদৃষ্টি দ্বারা হইবার সম্ভব। ঈশ্বরবিষয়ক ও ধর্ম্মবিষয়ক আলাপনই আমাদিগের যথার্থ হিতসাধক। * * যদি আমরা সেই সকল কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হই যাহা তাঁহার ইচ্ছানুযায়িক, তাহা হইলে তাঁহার প্রসন্নমুখ আমাদিগের প্রতি কেমন স্নিগ্ধরূপে প্রেরিত হইবে, কেমন তাঁহার সহিত আমাদের সহবাস লাভ হইবে, * *। যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্ তাঁহারা ঈশ্বরের প্রতি প্রেমোজ্জ্বল মনে ধাববান হয়েন। তাঁহাদিগের দূরদৃষ্টি অনন্তকাল পর্য্যন্ত গমন করে। তাঁহারা বর্ত্তমান সুখেও সুখী হয়েন এবং ভবিষ্যৎ আশাতেও প্রফুল্ল থাকেন। পাপী যুবকদিগের এ প্রকার ভাবের সম্ভাবনা নাই * * তাহারা অনন্তকালের পর্য্যালোচনা মাত্র করিলেই ভয়ে কম্পিত হয়। তাহারা মনে করে যে এই সকল বিষয় ভাবিতে গিয়া পাছে তাহাদিগের মন সংসার হইতে আকৃষ্ট হয়, পাছে অনন্তকালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে গিয়া সংসারিক অনেকানেক মলিন সুখ হইতে তাহাদিগকে ছিন্ন হইতে হয়। এই প্রকার তাহারা পশুর ন্যায় বর্ত্তমান সুখকেই সর্ব্বস্ব মনে করিয়া ভবিষ্যতের প্রতি চক্ষুরুন্মীলন করে না, সাংসারিক কোনও বস্তুর প্রতি লোভ সম্বরণ করিতে পারে না এবং ইচ্ছার প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে তাহা কখনও অতিক্রম করিতে পারে না। * * * কোন্ ব্যক্তি ইহা জানিয়া সুখী থাকিতে পারে যে, যে পর্য্যন্ত আমি

ইহলোকে জীবিত রহিয়াছি সেই অবধি যে সকল আমোদ-প্রমোদ সম্ভোগ করিয়া লইতে পারি, ইহার পরে আর কিছুই নাই?" ('পুণ্য', চৈত্র, ১৩০৭)।

নবীনের নবভাব—এ সংসারই সর্ব্বস্ব! নারীর আদর্শের বিচারেও এই হিসাব

আমাদের প্রাচীন ঋষিগণেরও এই শিক্ষাই ছিল; এইরূপ ঈশ্বরমুখী দূরদৃষ্টি লইয়াই মানুষ তাহার সকল কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের ও সুখ-দুঃখের বিচার করিবে—তাঁহারা আমাদের এই শিক্ষাই আবহমান কাল হইতে দিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আজ সেদিন আর নাই। তাঁহাদের বাক্য ঠাকুরমার রূপকথার মতই আজ আমাদের নিকট অলীক আজবকথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ যেটুকু তাঁহাদের মানি, সেটুকুও অন্তরের টানে বা বিশ্বাসের বশে বোধ হয় নয়, যদিই তাঁহাদের নামটুকু উচ্চারণ করিয়া বিশ্বের দরবারে একটুকু আভিজাত্য লাভ করা যায়—শুধু সেই অসাধু প্রলোভনে। যাহা কোনও কালে বড় ছিল, সত্য বলিয়া খ্যাতি পাইয়াছিল, উহার সকলখানিই যে আজও বড় থাকিবে বা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারিবে না—এ কথা যে আমাদের নয়, বহুবার সে কথা তো বলিয়াছি, কিন্তু আবার একথাটাও বারবারই আমাদের জিজ্ঞাস্য যে, এই সত্যমিথ্যার ছোট-বড়র বিচারটুকুও আমরা করিয়াছি কিনা? যাঁদের নাম তুলিয়া গর্ব্ব উপার্জ্জন করিতে যাইতেছি, সেই গর্ব্ব দেওয়ার অধিকার তাঁদের সত্যসত্যই যে অনেকখানি ছিল আমরা নিজেরাও তা বিশ্বাস করি কিনা? যদি 'ছিল' বুঝিয়া[illegible], তবে নিজেরাও তাঁদের মনে-প্রাণে মানি না কেন? আর যদি 'ছি[illegible]না'ই বুঝিয়া থাকি, একটা ফাঁকা কথার ওপরে মিথ্যা বিশ্বের দরবারে 'বাহবা' লইতেই বা যাই কোন্ মুখে?

যাঁহারা নারীকে আজ শুধু এই দৃশ্যমান সংসারটীর মধ্যেই সমগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সর্ব্বকর্ম্মে সর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে বলেন, তাঁহারাও যে ঈশ্বর মানেন না, অনন্ত জীবন মানেন না, এই বিশ্বসৃষ্টির পেছনে ভগবানের যে একটা বিরাট অভিপ্রায় আছে—তাহা স্বীকার করেন না, বা সেই অভিপ্রায়ের কোনও একাংশ সম্পূরণকল্পেই যে জীবমাত্রেরই সৃষ্টি একথাও গ্রাহ্য করেন না—তাঁহাদিগকেও এমন বলিতে প্রায় শোনা যায় না। বলা যায়, তবে আর্য্যঋষিদের সঙ্গে অন্ততঃ এইগুলি লইয়া অবশ্যই তাঁহাদের মারামারি নাই, বিসম্বাদ নাই। তবে কার্য্যক্ষেত্রে এই বিপরীত বুদ্ধি দেখা যায় কেন? যে তাজমহল দেখিতে যাইবে, তাহাকে তাঁহারা বর্দ্ধমান-লোকেল-ট্রেণে তুলিয়া দেন কেন, বা যে সাগর দেখিতে ছুটিয়াছে, তাহাকে হরিদ্বারের টিকিট কিনিয়া দেন কোন্ সুবিবেচনার বশে?

এজাতীয় বুদ্ধির নীচে কোনও দিকে কোনো ভ্রান্তি আছে বা গলদ আছে—এ কথা নিশ্চয়। হয়, জীবের এই অনন্ত জীবনের কথা ও বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে তার সংযোগের কথা মুখে অস্বীকার না করিলেও মনেপ্রাণে তাঁহারা বিশ্বাস করেন না, নয় ত, বিচার-বুদ্ধি তাঁদের সত্য সত্য এত দুর্ব্বল যে, কিসে কি হয়, কোন্ পথ কোথায় গিয়া ঠেকে—তাহা তাঁহারা জানেন না বা বোঝেন না। এ দু'টাই মারাত্মক। বাহিরে যুক্তি-তর্ক নাই, প্রতিবাদ নাই, অথচ ভিতরে ভিতরে অনাহূত অকারণে মনগড়া একটা ধারণা লইয়া তাঁহারা বসিয়া আছেন এবং সেই অনুযায়ীই কার্য্য করিয়া যাইতেছেন—এটাও যেমন সর্ব্বনেশে, আবার অপর দিকে, একটা অন্ধখেয়াল বা মূর্খতা বা একগুয়েমীর বশে, বা কোনও তুচ্ছ অলীক স্বার্থের প্রলোভনে একটা মিথ্যা পথকে সত্য ধরিয়া বসিয়া আছেন, সেটাও তেমনই তুল্য বিপজ্জনক ও ভয়ানক।

পাশ্চাত্য শিক্ষাই অনেক গোল বাধাইয়াছে

এ ভুল-ভ্রান্তির জন্য দায়ী কে? আমরা আবার বলি, বোধ হয় অনেকখানি আমাদের এই পাশ্চাত্য শিক্ষার ধারাটি এবং বহু পরিমাণে তা'কে দেওয়া আমাদের এইজাতীয় অন্ধভক্তি ও নির্ভর।

আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিয়া সে আমাদিগকে অনেক-কিছু নূতন দিয়াছে বটে, কিন্তু জোর করিয়া আমাদের ঘরে এই নূতনের ঠাঁই করিতে গিয়াই আবার অনেক মূল্যবান পুরাতন সামগ্রীকেও ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। তোরঙ্গ খুলিয়া হীরা-জহরৎ সরাইয়া দিয়া সেখানে ঝুড়ি-ঝুড়ি কাঁচের মেকী অলঙ্কার ঢুকাইয়াছে। সাগরের মাছকে ডোবায় ফেলিয়া রাশি রাশি পানা, শৈবাল ও কুমুদের উপহার দিয়াছে সত্য, কিন্তু সাগরের মুক্ত সচ্ছন্দতা দিতে পারে নাই, দেয় নাই। দূরের যাত্রীকে নিকটের পথের পরিচয়ই অনেক দিয়াছে, কিন্তু তার সত্যকার ওই দূরের গন্তব্যপথটীকে সে নিজেও আজ তল্লাস করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই।

পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরুদ্ধে এমত একটা গুরুতর অভিযোগ আনয়নের নিমিত্ত কেহ যদি আমাদিগকে গালি দিতে উদ্যত হয়েন, এইখানে সে আশঙ্কায় অপরের দু'চারিটী কথাও উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

এ মোহ কি করিয়া কবে হইতে আসিল?

উক্ত ঠাকুর পরিবারেরই অপর শ্রদ্ধেয় ক্ষিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উক্ত 'পুণ্য' নামক মাসিকের বাং ১৩০৫ সালের আশ্বিন-কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের সংখ্যায় হিন্দুধর্ম্ম ও স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ক দুইটী সারগর্ভ প্রবন্ধে, যে-সকল নব্য শিক্ষিত ব্যক্তি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রভাবে অন্ধতাবশতঃ হিন্দুধর্ম্মবিরোধী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে 'বিজ্ঞানান্ধ' আখ্যায় ভূষিত করিয়া লিখিয়াছেন :—

"যাঁহারা যত অধিক ইউরোপীয় সংস্পর্শ লাভ করিয়াছেন, সচরাচর তাঁহারাই বিজ্ঞানান্ধ সম্প্রদায়ের তত অধিক অনুরক্ত হইয়া পড়েন। এই সংস্পর্শ পাশ্চাত্য পুস্তক পাঠেও লাভ করা যায়, পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণেও এইরূপ ফল পাওয়া যায়। * * তাঁহাদের কাছে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের প্রত্যেক কথা, তাহা সিদ্ধ হউক বা না হউক, বেদবৎ মান্য; কিন্তু স্বদেশীয় শাস্ত্রের সহস্র সহস্র বৎসরের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার ফুৎকারে উড়াইয়া দিবার যোগ্য। * *

"হিন্দু-স্কুলের স্থাপনাই এইরূপ অশ্রদ্ধেয় ভাবের প্রধান উৎপত্তি-হেতু; বিশেষতঃ ডিরোজিওর ন্যায় তদানীন্তন শিক্ষকদিগের কৃপায় ছাত্রদিগের হৃদয়ে ইহা বদ্ধমূল হইবার পক্ষে অনেক সহায় জুটিয়াছিল। * * ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে যুবকদিগের ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য কেবলমাত্র দেশীয়দিগের বদান্যতায় 'হিন্দু' বিদ্যালয় বা কলেজ স্থাপিত হয়। * *

"এই অশ্রদ্ধেয় ভাবের বিস্তার বিষয়ে হিন্দু-স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক অপেক্ষা ডিরোজিও সাহেবের শিক্ষাদানই সর্ব্বাপেক্ষা সহায় হইয়াছিল। তিনি নিজে নাস্তিক ছিলেন এবং তাঁহার ছাত্রদিগকে শাস্ত্রের কথা দূরে থাক্, ঈশ্বর প্রভৃতিকে ছাড়িয়া ধাম্মিক হইবার উপদেশ দিয়া কতকগুলি অহংবৃদ্ধ অধাম্মিক ছাত্রের জন্মদান করিবার সুন্দর উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। * * ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহোদয়ও তাঁহার "সেকাল আর একাল" পুস্তকে নবযুগের আদি শিক্ষার ফল সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন—"তখনকার সময়গুণে ডিরোজিওর যুবক শিষ্যদিগের এমনই সংস্কার হইয়াছিল যে, মদ-খাওয়া ও খানা-খাওয়া সুসংস্কৃত ও জ্ঞানালোক-সম্পন্ন মনের কার্য্য। তাঁহারা মনে করিতেন, এক এক গ্লাস মদ খাওয়া কুসংস্কারের উপর জয়লাভ করা। কেহ কেহ উদ্ধতবেশে দোকানদারদের নিকটে গিয়া বলিতেন "গরু খেতে পারিস? গরু খেতে পারিস?"—

*এইরূপে প্রচলিত রীতিনীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাঁহারা মহা আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেন। * **

"ডিরোজিও প্রভৃতির উপদিষ্ট নাস্তিকতা এবং ভ্রান্ত উন্নতির পথ হইতে প্রধানতঃ ব্রাহ্মসমাজ এবং মাত্র নাস্তিকতা হইতে সুপ্রসিদ্ধ খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক ডফ্ সাহেব তদানীন্তন যুবকবৃন্দকে রক্ষা করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়া অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, ব্রাহ্মসমাজেও এমন এক সময় আসিয়াছিল, যে সময়ে তাহার প্রচারকগণ নিতান্ত শৈশবের ন্যায় আচরণ করিয়া খৃষ্টানদিগের ন্যায় স্বীয় জাতীয় শাস্ত্রের প্রতি হিন্দুসমাজের অনুরাগ হ্রাস করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তজ্জন্য আমাদের অদৃষ্টে যে কুফল ফলিবার ছিল তাহা ফলিয়াছে এবং আজও ফলিতেছে। বর্ত্তমানে দুঃখের ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আশার ক্ষীণ আলোক দেখা যাইতেছে, ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই আপনাদিগের ভ্রম দেখিতে পাইয়া একটু পশ্চাদ্‌গামী হইবার চেষ্টা করিতেছেন। * *

"রামমোহন রায়ের পরলোক গমনের পরে শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের ভার গ্রহণ করিলে ঘটনাচক্রে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন কয়েক ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মকারক হইয়াছিলেন। তাঁহারা খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারকগণের উপদেশে লালিত-পালিত হইয়া শাস্ত্রজ্ঞান একবারেই জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন এবং সেই কারণে শাস্ত্র ও ঋষি-মুনিদিগের প্রতি তাঁহাদের ভক্তিশ্রদ্ধাও খুব কমই ছিল; তাঁহারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের গ্রন্থাদিতে যথেষ্ট বুৎপন্ন ছিলেন এবং সেই কারণে পাশ্চাত্য পণ্ডিত-দিগকেই তাঁহারা হৃদয়ের সমুদয় শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্পণ করিতে অগ্রসর হইতেন। * * * পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ব্রাহ্মগণ পৃথক্ সমাজ স্থাপন করিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কিছু বেশীরকম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তখন বুঝিতে পারিলেন না যে সমাজে অবস্থান করিতে গেলেই

ব্যক্তিগত স্বাধীনতার একটী সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। তাঁহারা এই সহজ কথা ভুলিয়া গিয়া সর্ব্বপ্রকার সমাজবন্ধন ছিন্ন করিতে লাগিলেন এবং ইংরেজী ভাষায় চারিদিকে ইহার মন্ত্রবীজ বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। বিলাতপ্রত্যাগত প্রভৃতি পাশ্চাত্যসংস্পর্শপ্রাপ্ত এবং স্বাধীনতার নামমোহে বিমূঢ় ও তরলরুধির অধিকাংশ ব্যক্তি এই সকল মন্ত্র কণ্ঠভূষণ করিয়া লইলেন। * * এইরূপে অতিমাত্র ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিষবীজ যথেচ্ছাচারিতা-বৃক্ষের উৎপাদক হইয়া সমগ্র ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে সুফলপ্রসব-সম্ভাবনার পথে অত্যধিক ও অতি গুরুতর অন্তরায় সমূহ উপস্থিত করিয়াছে ও করিতেছে।"

অবরোধ-প্রথার তাৎপর্য্য

শ্রদ্ধেয় লেখকমহাশয় অতঃপর প্রসঙ্গক্রমে যে আরও কয়টী কথা বলিয়াছেন, এ পুস্তকের আলোচ্য বিষয়ের সহিত তাহাদের সম্পর্ক আরও নিকটতর। পাঠিকা/পাঠকবর্গদিগকে উহাদেরও কিয়দংশ উপহার দেওয়ার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। যথা—

"তাঁহাদিগের স্ত্রী-কন্যাদিগকে বি-এ, এম-এ উপাধি লাভ করিতে দেখিলেই তাঁহারা সুখী হয়েন। শাস্ত্রাদিতে যে রমণীর হৃদয়ের অনুকূল অনেক শিক্ষাব্যবস্থা আছে, তাহা তাঁহারা চক্ষু তুলিয়া দেখিতেও চাহেন না। অবরোধ প্রথা সম্বন্ধেও তাঁহারা নিতান্তই অন্ধভাবে ব্যবহার করেন। শাস্ত্রে কিরূপ অবরোধপ্রথা অনুমোদিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনায় আনয়ন করা বোধ হয় তাঁহারা আবশ্যকই মনে করেন না। তাঁহারা যে অতিমাত্র স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী হইয়া অপরিণামদর্শীর ন্যায় কার্য্য করিতেছেন, তাহা হয় বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না অথবা অনুকরণের ভার মস্তিষ্কে বহন করিয়া বাস্তবিকই স্থূলবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছেন।"

"* * আমরা এ কথা সাহসের সহিত বলিতে পারি যে অন্ততঃ এই দুর্ব্বল ভারতবর্ষে বৃদ্ধ ঋষিরা নিজেদের দেবত্ব হইতেই * * রমণীর দেব-ভাব রক্ষা করিবার জন্যই স্ত্রীজাতির অবরোধ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। * * রমণীর মাতৃত্ব সুন্দর উপলব্ধি করিয়াই ঋষিরা স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতাবিষয়ক সকল ব্যবস্থাই তদুপযোগীরূপে প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। * * বেদেতে স্ত্রীলোকের যথাযোগ্য পরাধীনতার কথাও আছে এবং স্ত্রীলোককে সম্মান দিবার কথাও বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ঋষিরা যথেচ্ছবিচরণে স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণ দূষিত হইতে পারে বলিয়া তাহার নিষেধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাতে আমরা কখনই এমন কথা বলিতে পারি না যে তাঁহাদের পশুত্ব হইতে অর্থাৎ পশুসাধারণ ধর্ম্ম প্রভুত্বপ্রিয়তা হইতে ভারত-রমণীর অবরোধপ্রথার উৎপত্তি হইয়াছে—বিপরীতে আমরা বলি যে স্ত্রীলোকের মাতৃত্ব রক্ষার জন্য তাঁহারা স্বীয় দেবভাবপ্রণোদিত হইয়াই ইহা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।"

"* * সমস্ত পাশ্চাত্যজাতি আত্মসুখ বর্দ্ধিত করিতে শিখিয়াছে, বলিদান করিতে শিখে নাই। আমাদের বৈবাহিক মন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে মাতৃত্ববিকাশেরই ভাব সমগ্র বিবাহপদ্ধতিকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে এবং তাই আমরা অধিকাংশস্থলে চঞ্চলস্বভাবা, আত্মনির্ভরগর্ব্বিতা, বিলাসনিমগ্না ভামিনীর পরিবর্ত্তে "পৃথিবীর ন্যায় ধীরস্বভাবা, ছায়ার ন্যায় অনুগতা, স্বচ্ছন্দদয়া, হিতকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সখীর ন্যায় হিতকারিণী সহধর্ম্মচারিণী" প্রাপ্ত হই।" * *

"* * প্রকৃত হিন্দুশিক্ষার গুণে হিন্দুরমণীরা মাতৃত্বকেন্দ্রে দাঁড়াইয়া সকল কর্ম্মই সুনির্ব্বাহ করিতে পারেন, ইহার উপরে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে তো কথাই নাই।"

কয়েকটী সতর্ক বাণী

পাশ্চাত্যশিক্ষার এই আদর্শের বিরুদ্ধে আজকাল অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগেরও যে বিতৃষ্ণভাব জাগিয়া উঠিতেছে, উহারই উল্লেখ করিয়া বারাণসীধামে বিগত 'অল্-এসিয়া-এডুকেশন-কনফারেন্সে'র উদ্বোধন-কালে ভূতপূর্ব্ব মহারাজা বেনারস্ বলিয়াছিলেন—

"The supreme aim (of education) has to be determined first, before we proceed to the organisation and curriculum. * * Social efficiency is the final aim in the West, but this is not a sufficiently high ideal. The ideal of society, or even of nation is too mean and insignificant to be compared with the grand conception of humanity. If the function of education be to take the child at the brute lavel only the cause of humanity will not advance an inch."

"শিক্ষার আয়তন ও বস্তু ঠিক করিবার পূর্ব্বে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যটী স্থির করা আবশ্যক। ** পাশ্চাত্যজগতে সমাজের উৎকর্ষসাধনই একমাত্র চরম উদ্দেশ্য, কিন্তু এ আদর্শটী যথেষ্ট উচ্চাদর্শ নয়। মনুষ্যত্বের বিরাট আদর্শের নিকট একটা সামাজিক বা, এমন কি, একটা জাতীয় আদর্শও এত তুচ্ছ যে উহার সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। শিক্ষার কার্য্য যদি শিশুদিগকে কেবলমাত্র একটা পশুসুলভ স্তরে লইয়া যাওয়াই হয়, মানুষের প্রকৃত উন্নতি এক পা-ও তাহাতে অগ্রসর হইবে না।"

তৎপরে মহারাজাবাহাদুর জনৈক বিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিতের নিম্নলিখিত উক্তিটীর উল্লেখ করেন—

"We repeat that the aim of schooling in all its occasions and pursuits is to help out pupils to see

themselves and their neighbours in the light of the Universal."

"আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি যে, সকল সময়ে এবং সর্ব্বক্ষেত্রেই শিক্ষার উদ্দেশ্য এইরূপ হইবে যে তদ্বারা বিদ্যার্থিগণ তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের প্রতিবাসিবর্গকে ভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টরূপে দেখিবার সহায়তা পায়।"

তদনন্তর মহারাজাবাহাদুর উপসংহারে পুনঃ উপদেশ দিয়া কহিতেছেন, "You have to revive this oriental spiritualism and animate with it the future generations of the East so that no boy or girl may lose sight of his or her true relation to humanity at large through the universal. * * Let the Asiatics but retrim and replenish the torch of spiritualism and hold it aloft to the East its soothing and peaceful celestial light on the face of the Earth, and the time will not be distant when the West disgusted with the heat and dazzle of the material civilisation will turn to it for relief, peace and bliss."

"আপনাদিগকে এই প্রাচ্য আধ্যাত্মভাবটী জাগ্রত করিতে হইবে এবং প্রাচ্যের ভবিষ্যৎ সন্তানদিগকে ইহাদ্বারা এমতভাবে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে, যেন কোনও বালক বা বালিকা, সমগ্র মনুষ্যজাতির সঙ্গে ভগবানমূলে প্রাপ্ত তাহার সংযোগের সত্যটীকে দৃষ্টিপথের আড়াল না করে। * * এসিয়াবাসিগণ এই আধ্যাত্মজ্ঞানের বর্ত্তিকাটীকে সংশোধিত ও সংস্কৃত করিয়া এবং ইহার স্নিগ্ধ, শান্ত ও [illegible]ীয় আলোককে পৃথিবীর বুকে ছড়াইয়া দিয়া প্রাচ্যজগতে উচু করিয়া ধরুন। ঐহিক বৈভবের মোহ ও ব্যস্তসমস্ততার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া স্বস্তি, শান্তি ও পরমার্থের লোভে অচিরেই পাশ্চাত্যজগৎও ইহার দিকেই ফিরিবে।"

এ কথা যে মিথ্যা নয়, আজ তার সাক্ষাৎ ও জাজ্বল্যমান প্রমাণ —বিশ্ববরেণ্য মহাত্মা গান্ধী। প্রাচ্যের এ ঢেউ সত্যই আজ কোথায়ও কোথায়ও পাশ্চাত্য ভাবুকমণ্ডলীকেও নাড়াচাড়া দিতেছে। সম্প্রতি (জানুয়ারী, ১৯৩২ খৃঃ) এদেশের সংবাদপত্রগুলিতে একটা বিলাতী খবর এই প্রকাশিত হইয়াছে যে, সে-দেশের সুপরিচিত হ্যারো বিদ্যালয়ের হেড্‌মাষ্টার ডাঃ সিরিল নোরউড্ কোন্ এক বক্তৃতায় নাকি নিম্নলিখিতরূপ কয়েকটী উক্তি করিয়াছেন :—

"There never could be peace for a nation or a society of nations where the material values of money, pleasure, and the various forms of Mammon were the sole objects of human pursuit. * * In some quarters it had come to be regarded as a debatable matter whether women need be chaste and men honest. In a society that was more and more obsessed by sex, gambling, the pursuit of pleasure and an inability to be still, it was bound to be a long and difficult process to create a sense of the true values of life."

"যে জাতি বা জাতিমণ্ডলীর মধ্যে অর্থ, বিলাস ও এইজাতীয় ভোগ্যবস্তুসকলের ঐহিকমূল্যটাই একমাত্র মানুষকে কর্ম্মে উদ্দীপিত করে, সেজাতি বা জাতিমণ্ডলীর মধ্যে শান্তি কখনও আসিতে পারে না। মানুষের পক্ষে সৎ এবং নারীর পক্ষে সতী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, কাহারও কাহারও নিকটে একথাটাও এখন একটা সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে! যে-সমাজ যৌনবিলাস, জুয়া ও ভোগের অন্বেষণেই প্রমত্ত এবং স্থৈর্য্যাবলম্বনে অক্ষম, তথায় জীবনের সত্য মূল্য সম্বন্ধে চৈতন্য জাগরিত করা—অবশ্যই একটু দুঃসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।"

এইভাবে এবিষয়টার এখানে এত দীর্ঘ আলোচনা করার অর্থ এই যে, যে-ভ্রমবশতঃ নারীসমাজে এতগুলি উৎকট সমস্যা আজ তাল পাকাইয়া উঠিতেছে, উহাদেরই সমাধান কল্পে উহার নাড়ী-নক্ষত্র-গুলিকেও একটু নাড়িয়া চাড়িয়া দেখা কর্ত্তব্য। এই ভঙ্গুর জগৎটাই মানুষের সর্ব্বপ্রকার সুখদুঃখ ও উন্নতি-অবনতির একমাত্র ক্ষেত্র—যে-বিভ্রাট অনেক পণ্ডিতলোকের মনেও এই ধারণাই জন্মাইয়া দেয়, পূর্ব্বাহ্নে উহার চূড়ান্ত রকম কিছু আলোচনা না হইলে পরে অপরাপর অনেক কথার সমাধানেই বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে।

পাশ্চাত্য মোহের দারুণ কুজ্ঝটিকা

এইক্ষণ, এই পাশ্চাত্য শিক্ষার ঘুরপাকে আমাদের অনেক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গকেও অনেক সময়ে কেমন চিত্তবিভ্রমে পড়িয়া দিশাহারা হইতে হয় এবং উহারই ফলে আজ পর্য্যন্ত কেমন অনেকগুলি জটিল সমস্যারও সৃষ্টি হইয়াছে—উহাই আমাদের দ্রষ্টব্য।

দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়, সাহিত্যসম্রাট অতুলপ্রতিভাবান বঙ্কিমচন্দ্রকেও এককালে এই আবর্ত্তে পড়িয়া বেশ একটু ঘুরপাক খাইতে হইয়াছিল।

বঙ্কিমের সাহিত্যসম্পদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা অবশ্যই এবিষয়টী লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, তাঁহার ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় কয়েকটী সিদ্ধান্তের পরপর অল্পাধিক অদলবদল হয়। আগে যাহা লিখিয়াছিলেন, পরে কতকাংশে তাহা পরিবর্ত্তিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; এবং যতদূর বোঝা যায়, এই [illegible]কালীন ভুলচুক্-গুলির মূলেও ছিল তাঁহার ওই প্রথমাবস্থার পাশ্চাত্যশিক্ষার অপরিমিত প্রভাব। জীবনের প্রথমভাগে এই পাশ্চাত্যশিক্ষার মন্দিরেই মাতা সরস্বতীর বরাভয়মণ্ডিত কল্যাণহস্ত সর্ব্বপ্রথম তাঁহার সাহিত্যিক

প্রতিভাকে স্পর্শ করিয়া মুঞ্জরিত করিয়া তোলে ; কিন্তু দিব্যচক্ষুর বিশেষ পরিপুষ্টতা ও সার্থকতা তখনই তাঁহার লাভ হইয়াছিল, যখন প্রাচ্যের জ্ঞানমন্দিরেই মায়ের অমৃতভাণ্ডারটীর সান্ধনে তাঁহাকে হানা দিতে হইয়াছিল।

বোধ হয় প্রথমাবস্থায় এই পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবের ফলেই, আমরা দেখিতে পাই যে, প্রাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট তাঁহার ঋণস্বীকারের বড় বাহুল্য। তাঁহার পরবর্ত্তী লেখাগুলিতে এসম্বন্ধে তত বাহুল্যতা দৃষ্ট হয় না। বরং 'কৃষ্ণচরিত্র'-গ্রন্থে অনেকস্থলে তিনি তাঁহাদিগকে দস্তুরমত গালি দিয়া ভূত ছাড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রেও অনেকটা এইরূপই ঘটিয়াছিল। প্রথমাবস্থায় যে-ভাব ছিল, পরবর্ত্তীকালে প্রাচ্যজ্ঞানভাণ্ডারের প্রভাবে আসিয়া তাহার অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটে। যে নারীবিষয়ক প্রসঙ্গে আজ আমরা লিখিতেছি, উহার সম্বন্ধেও তখন তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, অনেকটা উহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের প্রভাবেই লিখিয়াছিলেন বলিয়া বেশ মনে হয়। কেননা, ঐ লেখাগুলির কোথাও কোথাও যুক্তিতর্কের শিথিলতা স্পষ্ট দেখা যায়, এবং তাঁহার পরবর্ত্তী মতবাদের সঙ্গেও এইকালীন মতবাদগুলির তেমন সাদৃশ্য নাই। ধার-করা মনোভাবের সমর্থনে প্রথমাবস্থায় জোর করিয়া লিখিতে গিয়াই বোধ হয় তিনি এই বিপদে পড়িয়াছিলেন।

অতুলপ্রতিভাবান বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে, ছোটমুখে আমরা এমন বড় কথা বলিতেছি, ইহা অনেকেরই অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকিবে। কিন্তু এই সামান্য অভিযাগে তাঁহার বিরাট প্রতিষ্ঠার গায়ে কোথারও যে একটু আঁচড় লাগিবে, আমরা এমত আশঙ্কা করি না, বা তাঁহাকে খাটো করিবার উদ্দেশ্য লইয়াও এপ্রসঙ্গের অবতারণা করা হয় নাই। বরং তাঁহার পাণ্ডিত্য ও শ্রেষ্ঠতার উপরে আমাদের অত্যধিক বিশ্বাস আছে

বলিয়াই, তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই আজ ইহা দেখাইতে চাহিতেছি যে, পরবর্ত্তীকালে যে সত্যনির্দ্ধারণে তাঁহার কোন কষ্ট হয় নাই, প্রথমাবস্থায় উহা নির্দ্ধারণেই পাশ্চাত্য মনোভাবের প্রভাবে তাঁহাকেও অনেক গোলে পড়িতে হইয়াছিল।

'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রথমপ্রচারকালে উক্ত পত্রিকার 'নবীনা ও প্রবীণা' প্রবন্ধে নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা বিষয়ে এই কথাগুলি তিনি লিখিয়াছিলেন :—

(১) "সকলেই জানেন স্ত্রীলোকের সম্মতি এবং সাহায্য ব্যতীত সংসারের কোনও গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হয় না। গহনা গড়ান ও গরু কেনা হইতে ফরাসিস্ রাজ্যবিপ্লব এবং লুথরের ধর্ম্মবিপ্লব পর্য্যন্ত সকলই স্ত্রীসাহায্য-সাপেক্ষ। * * ইহা বলা যাইতে পারে যে আমাদের শুভাশুভের মূল আমাদের কর্ম্ম, কর্ম্মের মূল প্রবৃত্তি এবং অনেক স্থানে আমাদের প্রবৃত্তি সকলের মূল আমাদের গৃহিণীগণ। অতএব স্ত্রীজাতি আমাদের শুভাশুভের মূল। * * কিন্তু এ কথাগুলি যাঁহারা ব্যবহার করেন তাঁহাদিগের আন্তরিক ভাব এই যে, পুরুষই মনুষ্যজাতি। * * স্ত্রীগণ পুরুষের শুভাশুভবিধায়িনী বলিয়াই তাঁহাদিগের উন্নতি বা অবনতির বিষয় গুরুতর বিষয়, বাস্তবিক আমরা সেরূপ কথা বলি না। * * তাঁহারা পুরুষদিগের শুভানুধ্যায়িনী হউন বা না হউন, তাঁহাদিগের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি * * কিন্তু সমাজের নিয়ন্তৃবর্গ সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে এই ভ্রমে পতিত তাঁহারা বিধান করেন যে, স্ত্রীলোকেরা এইরূপ আচরণ করিবে—কেন করিবে? উত্তর, তাহা হইলে পুরুষের অমুক মঙ্গল ঘটিবে ; অমুক অমঙ্গল নিবারিত হইবে। সমাজবিধাতৃদিগের সর্ব্বত্র এইরূপ উক্তি। কোথায়ও এ

উদ্দেশ্য স্পষ্ট, কোথায়ও অস্পষ্ট, কিন্তু সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। এইজন্যই সর্ব্বত্র স্ত্রীজাতির সতীত্বের জন্য এত পীড়াপীড়ি, পুরুষের সেই ধর্ম্মের অভাব কোথায়ও তত বড় গুরুতর দোষ বলিয়া গণনীয় নহে।"

(২) "সকল সমাজেই স্ত্রীজাতি পুরুষ অপেক্ষা অনুন্নত; পুরুষের আত্মপক্ষপাতিত্বই ইহার কারণ। ** আত্মপক্ষপাতী পুরুষগণ যতদূর আত্মসুখের প্রয়োজন, ততদূর পর্য্যন্ত স্ত্রীগণের উন্নতির পক্ষে মনোযোগী; তাহার অতিরেক তিলার্দ্ধ নহে। একথা অন্যান্য সমাজের অপেক্ষা আমাদের দেশে বিশেষ সত্য। ** পুরুষ প্রভু, স্ত্রী দাসী; স্ত্রী জল তুলে, রন্ধন করে, বাটনা বাটে, কুটনা কুটে। বরং বেতনভাগিনী দাসীরও কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু বনিতা-দুহিতার তাহাও ছিল না। আজিকালি পুরুষের শিক্ষার গুণে হউক, স্ত্রী-শিক্ষার গুণে হউক, বা ইংরেজের দৃষ্টান্তের গুণে হউক অবস্থাপরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু যেরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার সর্ব্বাংশই কি উন্নতিসূচক? ** বঙ্গীয় যুবতীগণের যে অবস্থান্তর ঘটিতেছে, তাহা কি উন্নতি? এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বকালে বঙ্গীয় যুবতী কি ছিলেন, এক্ষণে কি হইতেছেন, তাহা স্মরণ করা আবশ্যক।"

অতঃপর বঙ্কিমবাবু প্রাচীনাতে ও নবীনাতে তুলনা করিয়া প্রাচীনাদের সম্পর্কে শুধু বলিলেন, তাহাদের মুখের ঝাঁঝা, বেশভূষার বিকটত্ব ও কলহপ্রিয়তা বড় প্রবল ছিল, কিন্তু নবীনাদের বেলা বলিলেন—

(৩) "তাঁহাদিগের প্রথম দোষ আলস্য। প্রাচীনা অত্যন্ত শ্রমশালিনী এবং গৃহকর্ম্মে সুপটু ছিলেন, নবীনা ঘোরতর বাবু, ** গৃহকর্ম্মের ভার প্রায় পরিচারিকার প্রতি সমর্পিত। ইহাতে অনেক অনিষ্ট জন্মিতেছে,—প্রথম, শারীরিক পরিশ্রমের অল্পতায় যুবতীগণের শরীর বলশূন্য এবং রোগের আগার হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীনাদিগের, অর্থাৎ পূর্ব্বকালের যুবতীগণের শরীর স্বাস্থ্যজনিত অপূর্ব্বলাবণ্যবিশিষ্ট ছিল,

এক্ষণে তাহা কেবল নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের মধ্যে দেখা যায়। ** গৃহিণী রুগ্নশয্যাশায়িনী হইলে গৃহের শ্রী থাকে না; অর্থের ধ্বংস হইতে থাকে; শিশুগণের প্রতি অযত্ন হয়; সুতরাং তাহাদিগের স্বাস্থ্যক্ষতি ও কুশিক্ষা হয় এবং গৃহমধ্যে সর্ব্বত্র দুর্নীতির প্রচার হয়। যাহারা ভালবাসে, তাহারাও নিত্য রুগ্নের সেবার দুঃখ সহ্য করিতে পারে না, সুতরাং দম্পতীপ্রীতিরও লাঘব হইতে থাকে এবং মাতার অকাল মৃত্যুতে শিশুগণের এমন অনিষ্ট ঘটে যে, তাহাদিগের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহারা উহার ফলভোগ করে। সত্য বটে, ইংরেজ-জাতীয় স্ত্রীগণকে আলস্যপরবশ দেখিতে পাই, কিন্তু তাহারা অশ্বারোহণ, বায়ুসেবন ইত্যাদি অনেকগুলি স্বাস্থ্যরক্ষক ক্রিয়া নিয়মিতরূপে সম্পাদন করে। আমাদিগের গৃহপিঞ্জরের বিহঙ্গিনীগণের সে সকল কিছুই হয় নাই।"

(৪) "নবীনাগণ গৃহকর্ম্মে নিতান্ত অশিক্ষিতা এবং অপটু। কখনও সে-সকল কাজ করেন না, এজন্য শিখেনও না, ইহাতে অনেক অনিষ্ট ঘটে। প্রাচীনারা নিতান্ত ধনী না হইলে জল তুলিতেন, বাসন মাজিতেন, উঠান ঝাঁট দিতেন, রন্ধন তাঁহাদের জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। এ কিছু বাড়াবাড়ি; নবীনাদিগের এতদূর করিতে আমরা অনুরোধ করি না; যাহার যেমন অবস্থা, সে তদনুসারে কার্য্য করিলেই যথেষ্ট। ** যে স্ত্রী ভূমণ্ডলে আসিয়া শয্যায় গড়াইয়া, দর্পণসম্মুখে কেশরঞ্জন করিয়া, কার্পেট তুলিয়া, সীতার বনবাস পড়িয়া এবং সন্তান প্রসব করিয়া কাল কাটাইলেন, আপনার ভিন্ন কাহারও সুখবৃদ্ধি করিলেন না, তিনি পশুজাতির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ [illegible] হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীজন্ম নিরর্থক। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণকে আমরা গলায় দড়ি দিয়া মরিতে পরামর্শ দিই; পৃথিবী তাহা হইলে অনেক নিরর্থক ভারবহন যন্ত্রণা হইতে বিমুক্তা হয়েন।"

"গৃহিনী গৃহকর্ম্ম না জানিলে সকলই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে ; অর্থে উপকার হয় না ; অনর্থক ব্যয় হয় ; দ্রব্যসামগ্রী লুঠ যায় ; অর্দ্ধেক দাসদাসী এবং অপর লোক চুরি করে। বহুব্যয়েও খাদ্যাদির অপ্রতুল ঘটে ; ভালসামগ্রীর খরচ দিয়া মন্দসামগ্রী ব্যবহার করিতে হয় ; ভালসামগ্রী গৃহস্থের কপালে ঘটে না। পৌরজনে পৌরজনে অপ্রণয় এবং কলহ ঘটিয়া উঠে। অতিথি-অভ্যাগতের উপযুক্ত সম্মান হয় না। সংসার কণ্টকময় হয়।"

(৫) "প্রাচীনাদিগের সম্প্রদায়ের তুলনায় তাঁহারা (নবীনারা) ধর্ম্মে লঘু সন্দেহ নাই। বিশেষ যেসকল ধর্ম্ম গৃহস্থের ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত, সেইগুলিতে এখনকার যুবতীগণের লাঘব দেখিয়া কষ্ট হয়। ** প্রাচীনাগণের পাতিব্রত্য যেরূপ দৃঢ়গ্রন্থির দ্বারা হৃদয়ে নিবদ্ধ ছিল, পাতিব্রত্য যেরূপ তাঁহাদিগের অস্থি-মজ্জা-শোণিতে প্রবিষ্ট ছিল, নবীনা-দিগেরও কি তাই? নবীনাগণ পতিব্রতা বটে, কিন্তু যত লোকনিন্দা-ভয়ে, তত ধর্ম্মভয়ে নহে। ** দানাদিতে প্রাচীনাদিগের যেরূপ মনোনিবেশ ছিল, নবীনাদিগের সেরূপ দেখা যায় না। ** দানের আধিক্য করিলে এখন অনেক বাঞ্ছনীয় সুখে বঞ্চিত হইতে হয়। সুতরাং স্ত্রীলোক (এবং পুরুষ) আর তত দানশীল নহে।

"হিন্দুদিগের একটী প্রধান ধর্ম্ম অতিথিসৎকার। ** প্রাচীনাগণ এইগুণে বিশেষ গুণশালিনী ছিলেন। নবীনাদিগের মধ্যে সে-ধর্ম্ম একবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। ** ধর্ম্মে যে নবীনাগণ প্রাচীনাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহার একটী বিশেষ কারণ অসম্পূর্ণ শিক্ষা। ** অল্পবিদ্যার দোষ এই যে, ধর্ম্মের মিথ্যা মূল তদ্দারা উচ্ছিন্ন হয়, অথচ সত্যধর্ম্মের প্রাকৃতিক মূল সংস্থাপিত হয় না। সেটুকু কিছু অধিক জ্ঞানের ফল। ** যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষায় ব্যতিব্যস্ত, তাঁহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, আপনারা বালকবালিকাদিগের হৃদয় হইতে প্রাচীন

ধর্ম্মবন্ধন বিমুক্ত করিতেছেন, তাহার পরিবর্ত্তে কি সংস্থাপন করিতেছেন ?”

এই উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে আমরা ইহাই দেখাইতে চাহিতেছি যে, বঙ্কিমবাবু মনে করিতেন, সর্ব্বত্র নারী ও পুরুষের অধিকার এক এবং শুধু পুরুষের স্বার্থপরতা ও অসাধু প্রচেষ্টার ফলেই নারী আজ এত দুর্ব্বল ও অনুন্নত এবং ক্রমে ক্রীতদাসীর পদে অবনত হইয়াছে ; কেননা, সে আজ কেবল গৃহাবদ্ধা হইয়া বাটনা বাটে ও কুটনা কুটে, আর মাত্র সন্তান প্রসব করে। পুরুষের মত সর্ব্বত্র চলাফেরা করিয়া স্বাধীনভাবে সকল কাজকর্ম্ম করিবে—সে সুযোগ পায় না। তাঁহার এই জাতীয় ধারণার সত্যমিথ্যার বিচারটা একটু পরেই হইবে, আপাততঃ এই কথাগুলি হইতে আমরা এইমাত্র দেখাইতে চাই যে, এই ধারণাগুলিও তাঁহার সেই-সময়কার একটা পাশ্চাত্যপ্রভাবলব্ধ মনোভাবেরই ফল। একেতো ভাবগুলি একান্তই বিলাতী, তারপর এই প্রবন্ধটী লেখার কালে সত্যসত্যই যে তিনি বিলাতীসাহিত্যের অনুশীলনটাই একান্তভাবে করিতেছিলেন—তাঁহার সেকালের লিখিত নিজের অনেক লেখা হইতেই সে-পরিচয় পাওয়া যায়। প্রায় এইকালেই প্রকাশিত তাঁহার “সাম্য” নামক প্রবন্ধটী পাঠে জানা যায়, এইসময়ে জন্-ষ্টুয়ার্ট মিল, রুসো, ভল্‌টেয়ার প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ তাঁহাকে প্রায় পাইয়া বসিয়াছিল এবং সেকালে তিনি তাঁহাদের কাহারও কাহারও একজন ভক্ত হইয়াও উঠিয়াছিলেন। বস্তুতঃ সে সময় জন্-ষ্টুয়ার্ট মিলের ‘সব্‌জেক্‌সন্ অব্ উইমেন’ (নারীর অধীনতা) নামক বিখ্যাত পুস্তকখানাই যে তাঁহাকে অত্যন্ত প্রভাবান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল, উক্ত ‘সাম্য’ প্রবন্ধেই যথেষ্ট তাহার প্রমাণ ও উল্লেখ আছে।

'সাম্য' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র

এই প্রবন্ধে বঙ্কিমবাবু মিলকে সমর্থন করিয়া অনেক কথাই কহিয়াছেন, উহারও কিছু কিছু নমুনা এইখানে উদ্ধৃত করিলাম :—

(৬) "মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকার-বিশিষ্ট,—ইহাই সাম্যনীতি। * * স্ত্রীগণও মনুষ্যজাতি, অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী। যে যে কার্য্যে পুরুষের অধিকার আছে, স্ত্রীগণেরও সেই সেই কার্য্যে অধিকার থাকা ন্যায়সঙ্গত। * * স্বভাবগত বৈষম্য থাকিলেই যে অধিকারগত বৈষম্য থাকা ন্যায়সঙ্গত, ইহা আমরা স্বীকার করি না। দেখ, স্ত্রী-পুরুষে যেরূপ স্বভাবগত বৈষম্য, ইংরেজ-বাঙ্গালীতেও সেইরূপ। * * তবে আমরা ইংরেজ-বাঙ্গালীর মধ্যে সামান্য অধিকারবৈষম্য দেখিয়া এত চীৎকার করি কেন? * * যেসব বিষয়ে স্ত্রী-পুরুষে অধিকারবৈষম্য দেখা যায় সে-সকল বিষয়ে স্ত্রী-পুরুষে যথার্থ প্রকৃতিগত বৈষম্য দেখা যায় না। যতটুকু দেখা যায়, ততটুকু কেবল সামাজিক নিয়মের দোষ। * * বিখ্যাতনামা জন্-ষ্টুয়ার্ট মিল কৃত এতদ্বিষয়ক বিচারে এই বিষয়টী সুন্দররূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। * * অধীনতার দেশ, * * এখানে রমণী পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনী; যে বুলি পড়াইবে, সেই বুলি পড়িবে। আহার দিলে খাইবে, নচেৎ একাদশী করিবে। পতি * দেবতার প্রধান দেবতা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। দাসীত্ব এতদূর যে, পত্নীদিগের আদর্শস্বরূপা দ্রৌপদী সত্যভামার নিকট আপনার প্রশংসাস্বরূপ বলিয়াছেন যে, তিনি স্বামীর সন্তোষার্থ সপত্নীগণেরও পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন। এই আর্য্যপাতিব্রত্যধর্ম্ম অতি সুন্দর, ইহার জন্য আর্য্যগৃহ স্বর্গতুল্য সুখময়। কিন্তু পাতিব্রত্যের কেহ বিরোধী নহে; স্ত্রী যে পুরুষের দাসী মাত্র, সংসারের অধিকাংশ ব্যাপারে স্ত্রীলোক অধিকারশূন্যা, সাম্যবাদীরা ইহারই প্রতিবাদী। * * লোকে সুশিক্ষিত হইলে, বিশেষতঃ স্ত্রীগণ সুশিক্ষিত হইলে তাহারা অনায়াসেই

গৃহমধ্যে গুপ্ত থাকার পদ্ধতি অতিক্রম করিতে পারিবে। শিক্ষা থাকিলেই অর্থোপার্জ্জনে নারীগণের ক্ষমতা জন্মিবে এবং এইদেশীয় স্ত্রী-পুরুষ সকলপ্রকার বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলে, বিদেশী ব্যবসায়ী, বিদেশী শিল্পী বা বিদেশী বণিক্ তাহাদিগের অন্ন কাড়িয়া লইতে পারিবে না।"

(৭) "সাম্যনীতির এরূপ ব্যাখ্যা করি না যে, সকল মনুষ্য সমানাবস্থাপন্ন হওয়া আবশ্যক বলিয়া স্থির করিতে হইবে। তাহা কখনও হইতে পারে না। যেখানে বুদ্ধি, মানসিক শক্তি, শিক্ষা, বল প্রভৃতির স্বাভাবিক তারতম্য আছে, সেখানে অবশ্য অবস্থার তারতম্য ঘটিবে,—কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। তবে অধিকারের সাম্য আবশ্যক,—কাহারও শক্তি থাকিলে অধিকার নাই বলিয়া বিমুখ না হয়। সকলের উন্নতির পথ মুক্ত চাহি।"

বঙ্কিমবাবুর এইসমস্ত কথা ও যুক্তিতর্কের মূলে সেই "সব্‌জেক্‌সন অব্‌ উইমেন" বা মিলের নারীর পরাধীনতামূলক গ্রন্থ। মিলের এই গ্রন্থখানি সেকালে পাশ্চাত্যজগতে অতি তুমুল আন্দোলনই উপস্থিত করিয়াছিল এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, ইউরোপ-আদি অঞ্চলে, তখন ইহার খুবই প্রভাব। এই আন্দোলনের ঢেউ নূতন ইংরেজী-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশেও আমদানী হইয়া আসিলে আমাদের শিক্ষিতগণের মধ্যেও অনেকেই স্বভাবতঃ সেই আবর্ত্তে পড়িয়া যান। বঙ্কিমবাবুও এই শ্রেণীর একজন, তাঁহাদের অনেকের অপেক্ষাই বৈদেশিক শিক্ষায় অগ্রগণ্য, কাজে কাজেই তাঁহারও [illegible]ই অবস্থা ঘটিয়াছিল; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এসব মত তিনি ঠিক [illegible]তে পারেন নাই। যতদিন না স্বদেশীয় অমূল্য জ্ঞানসম্পদের সম্যক্ সন্ধান পাইয়া তদ্বিষয়ে অনুসন্ধানে তিনি যথার্থ অনুরাগী হন, ততদিনই তাঁহার এই মোহ ছিল, কিন্তু নিজ ধর্ম্মের, নিজ জ্ঞানভাণ্ডারের সংস্পর্শে আসিতেই সে-মোহ

দূরীভূত হইয়া যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কথার সুরেও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটে। বস্তুতঃ প্রথমাবস্থায় এই পাশ্চাত্যপ্রভাবের যুগে তাঁহার নিজের মীমাংসাগুলির উপর তাঁহার নিজেরও যে খুব দৃঢ়বিশ্বাস বা নির্ভর ছিল, এমন বোঝা যায় না। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে, এই কথাগুলির মধ্যেই সে-প্রমাণ অনেক পাওয়া যাইবে। উল্টো-পাল্টা কথাও অনেক সময় তিনি কহিয়াছেন, আর শেষপর্য্যন্ত মন্তব্য করিতে গিয়া সন্দেহাত্মক ভাবও অনেক ব্যক্ত করিয়াছেন। এই 'সাম্য' প্রবন্ধটীরই শেষের দিকে এক জায়গায় আছে—"আমরা যেসকল কথা এই প্রবন্ধে বলিয়াছি তাহা যদি সত্য হয়, তবে—" ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রাচ্যজ্ঞানভাণ্ডারের সংস্পর্শে আসিয়া শেষপর্য্যন্ত তিনি বেশই বুঝিয়াছিলেন, মানবচরিত্র ও মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের মুনি-ঋষিগণের আবিষ্কারের তুলনায় পাশ্চাত্যজগতের দার্শনিকদের আবিষ্কার নিতান্তই তুচ্ছ, নগণ্য ও বলিতে গেলে ছেলেখেলা মাত্র। তাই দেখিতে পাই, শেষের দিকে তাঁহার 'ধর্ম্মতত্ত্ব' ও 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রভৃতি গ্রন্থে, এমন কি, অনেকগুলি উপন্যাসের ভিতরেও, তাঁহার ভাব বদলাইয়া গিয়াছে।

হিন্দুনারী কি ক্রীতদাসী?

বঙ্কিমবাবুর পাশ্চাত্যভাবমূলক এইসব কথাগুলিকে কেন আমরা অসঙ্গত মনে করি, এইবার বুঝাইব।—

(ক) আমাদের নারীদের সম্বন্ধে তাঁহার এই 'ক্রীতদাসী' কথাটা বস্তুতঃ অযৌক্তিক। যাহারা কেবলমাত্র মুনিবের আজ্ঞায় তাঁহারই সুখ ও স্বার্থের নিমিত্ত সর্ব্বকাজ করে তাহাদিগকে ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী বলা যায়। কিন্তু হিন্দুপরিবারে হিন্দুনারীর অবস্থা ইহা হইতে স্বতন্ত্র। পরিবারের কর্ত্তা মোটামুটি ও সচরাচর স্ত্রীলোকের নিকট হইতে যে-সাহায্য গ্রহণ করেন, এবং উহার ফলে যে-সুফল জন্মায়, নারী ও পুরুষ ঐ

সকলে তুল্যভাবেই ফলভাগী। গৃহস্থালীর কাজে নারীকে আবদ্ধ রাখায় গৃহের যে শ্রী, শৃঙ্খলা ও পরিপুষ্টি লাভ হয়, পরিবারের সকল লোক সমভাবেই উহা ভোগ করে; নারী নিজে করে, তাহার সন্তান-সন্ততিরা করে এবং স্বামী, শ্বশুর-শ্বশ্রূ-আদি তাহারই প্রেম ও প্রীতির অপরাপর আস্পদেরাও করিয়া থাকে। তারপর, যাবতীয় কাজকর্ম্মে আদেশ-অনুজ্ঞাটাও সবসময় এক তরফা পুরুষদের নিকট হইতেই আইসে না। বঙ্কিমবাবু নিজেই লিখিয়াছেন—"স্ত্রীলোকের সম্মতি এবং সাহায্য ব্যতীত সংসারের কোনও গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হয় না,"—মায় গহনা-গড়ান, গোরুবেচা সব! প্রকৃতই এইরূপ; বিশেষ করিয়া, নানা গৃহস্থালীর ব্যাপারে নারীই প্রকৃতপক্ষে কর্ত্তা। জনষ্টুয়ার্ট মিলের দেশে অবস্থাটা হয়ত পূর্ব্বাপরই একটু স্বতন্ত্র, কিন্তু এইদেশে চিরকালই ঐ একইভাব। সুতরাং মিলের কথায় সায় দিয়া আমাদের ঘরের লক্ষ্মীদিগকে যদি ঐ ক্রীতদাসীর সংজ্ঞায়ই ফেলা যায়, অবশ্যই ভুল করা হইবে।

নারীপুরুষের অধিকার এক কি?

(খ) দ্বিতীয়তঃ—বঙ্কিমবাবু যে 'ইংরেজবাঙ্গালীর' উপমা দিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন—নারী-পুরুষের অধিকারের সাম্যটা নানা প্রাকৃতিক বৈষম্য সত্ত্বেও ঠিক; কেবলমাত্র পুরুষদিগের অব্যবস্থার ফলেই নারী সকল অধিকারে বঞ্চিত, নায্য হইলেও আমল পায় না,—এ যুক্তিটাও ভিত্তিহীন। এসম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেও আমরা অনেক কথাই কহিয়াছি, এবং এখনও পুনঃ এইকথার জবাবেই নিবেদন করিতেছি যে, কি করিয়াই-বা ইহা সম্ভব? বঙ্কিমবাবু যে কহিতেছেন, "যে-সব বিষয়ে স্ত্রীপুরুষে অধিকারবৈষম্য দেখা যায় সে-সকল বিষয়ে স্ত্রীপুরুষে যথার্থ প্রকৃতিগত বৈষম্য দেখা যায় না"—ও কথা কি ঠিক? পুরুষ

কি ইচ্ছা করিলেই নারীর মত সন্তান প্রতিপালন করিতে পারিবে বা স্নেহমমতায় পৌরজনের সেবাশুশ্রূষা করিতে পারিবে, না নারী পুরুষের মত লড়াই করিতে পারিবে বা দাঙ্গা নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে, বা চোর-ধরা, ডাকাত-পাকড়াও করা—এই-গুলিই পারিবে? যদিবা তর্কের খাতিরে বলা হয় যে, অভ্যাসে সকলেই সকল করিতে পারে, তবু আসল কথাটার মীমাংশা এ উত্তরে হইল কই? ঘোড়ার মত গাধাও মানুষ বহিতে পারে বটে, তবু ঘোড়ার মত তেমনভাবে পারে কি? নারী-পুরুষেও ঐরূপ। একের ক্ষেত্রে অপরে গিয়া জোর করিয়া কাজ করিতে চাহিলেই লাভ হইবে না। শক্তি বুঝিয়া, প্রকৃতি ও স্বভাব বুঝিয়াই যার যার বিশেষ কার্য্যের ভার তার তার উপরেই রাখিতে হইবে; নারী-পুরুষে প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে বৈ কি? ভগবান স্ত্রী-পুরুষকে এমনইভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহায়তা অনিবার্য্য, এবং এই অনিবার্য্যতামূলেই নারী-পুরুষের একটা চিরসম্পর্ক ও চির-বন্ধন। বাঙ্গালী ও ইংরেজের সম্পর্কটা হুবহু ঠিক এজাতীয় নহে। বাঙ্গালীর যে দৌর্ব্বল্য—উহার পরিবর্ত্তন বহুলভাবে চেষ্টাসাধ্য; কিন্তু সংসারক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের যে অক্ষমতা, উহা অনেকক্ষেত্রেই অকাট্যভাবে প্রকৃতিগত এবং ভগবানের অভিপ্রেত বলিয়া নিত্য। বাঙ্গালী চেষ্টা করিলে কখনও তার এ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইলেও ঘটাইতে পারে বটে, এবং তাই হয়ত ইংরেজের সঙ্গে তার সমান অধিকারের এই দাবীটাও সঙ্গত, কিন্তু যে-ক্ষেত্রে প্রকৃতিগত এই নিত্য-অক্ষমতার দরুণ নারী চিরকালের মতই পঙ্গু, চেষ্টা করিলেও যথায় কোনও দিন কোন প্রতিকারের সম্ভাবনাই তার নাই, অধিকন্তু সেরূপ পরিবর্ত্তনের কোনও আবশ্যকতাও দেখা যায় না, সে-ক্ষেত্রে নারী যদি এই অধিকারের দাবী সত্যসত্যই কখনও উপস্থিত করিতে যায়, উহা তবে তাহার মূর্খতা ছাড়া আর কি?

প্রীতির আনুগত্য দাসীত্ব নয়

আরও একটা দিক দিয়া এই বিষয়টীকে আমরা এইখানে বিচার করিতে ইচ্ছুক! নারী-পুরুষের এই ঘনিষ্ঠসম্পর্কের ফলেই হিন্দু-পরিবারে নারীদের একটা আনুগত্যের ভাবও অত্যন্তই স্বাভাবিক। স্বেচ্ছায়ই সে অনেকসময় এমনসব বা এতসব কার্য্য করে, যার জন্য তার উপরে কেহ কখনও কোন দাবী-দাওয়া বা অধিকারের ভাব রাখাই প্রয়োজনীয় মনে করেন না। নারীর এহেন ত্যাগের দৃষ্টান্ত বহুস্থলেই লক্ষিত হয়। কিন্তু অনেকে মনে করেন—এই অবস্থাটীও নারীর দাসত্ব। নারী দায়ে পড়িয়াই এইরূপ ত্যাগস্বীকার করে, দায়ে না পড়িলে হয়ত করিত না। একথায় আমরা সম্মত নহি। এরূপ ত্যাগস্বীকার স্নেহ-মমতার বশে নারী অহরহই করিতেছে এবং করিবেও। তাহার স্নেহপ্রবণ ও মমত্বময় অন্তরের এই বাহ্যবিকাশটী কোনসময়েই রুদ্ধ হইবার নহে। আবার তাহার এই ত্যাগের ক্ষেত্রটা পরিবারের গণ্ডীর মধ্যেই বিশেষভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। যেখানে যত সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা সেখানেই তত প্রীতি ও স্নেহমমতার বিকাশ দেখা যায়, এবং কাজেকাজেই ত্যাগের প্রেরণাও সেইখানেই তত অধিক। পতিপুত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সর্ব্বদা বসবাসের ফলে কোনও নারী যদি স্বেচ্ছায় সকল প্রকার মানসম্মান বা ভাগাভাগির কথাটা ভুলিয়াই যায়, পরিবারের ছোট-বড় সকল প্রকার কর্ম্মেই পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিতে চাহে বা করে, তবে তার ওই নির্ব্বিচার আনুগত্যটায় এতই কি আপত্তি?—এতই কি নিন্দার কথা? এ আনুগত্যের জন্য তাহাকে আমরা ক্রীতদাসী ভাবিব, না দেবী ভাবিয়া সম্মান করিব—বেশ করিয়া একথাটাও একবার সকলেরই ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

বাট্‌না-বাটা কুট্‌না-কুটাই 'দাসীত্ব' কিনা

(গ) বঙ্কিমবাবু অপর আর একটা ইঙ্গিৎ এই করিয়াছেন যে, হিন্দুর সংসারে নারীর অবস্থা বড় শোচনীয়।—তথায় সে শুধুই বাট্‌না বাটিয়া ও কুট্‌না কুটিয়াই জীবন যাপন করে, আর কোনও ভালকাজ করিবার অবকাশই পায় না; আর কোনও ভালকাজ করিয়া যে জন্ম সফল করিবে, সে সুযোগসুবিধাই তাহার হয় না। এ কথার উত্তরে আমাদের জিজ্ঞাস্য—আচ্ছা এই ভালকাজটা কি? পুরুষ নারীর ন্যায় গৃহাবদ্ধ নয়, কিন্তু পুরুষ নিজে কি করিতেছেন? আমাদের তো মনে হয়, আমাদের বাবুদের অপেক্ষাও আমাদের নারীদের অবস্থা বরং শ্লাঘ্য ও উন্নততর। বাবুরা তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া উদ্ধশ্বাসে আফিস-আদালতে ছুটেন, দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত কলম পিষিয়া মরেন, সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিয়া হাতপা ধুইয়া শয্যায় সটান্ শুইয়া পড়েন বা সুবিধা-সুযোগ ঘটিলে গল্পগুজব বা তাসপাশা পেটা—এইসবে কালকাটান—বড় সুখেই দিন যায়। তারপর, এই ভালকাজের মাহাত্ম্যে, দেখা যায়, কাহারও বহুমুত্র, কাহারও চক্ষের দোষ, কাহারও বা উদরাময়—ইত্যাদি ঘটিয়াছে। মেয়েরা যদি তাহাদের বাট্‌নাবাটা ও কুট্‌না-কুটাগুলির ভার না রাখিত, তাঁহাদের এই ভালকাজগুলির ফল তাহা হইলে আরও যে কত শুভ ও চমৎকার হইত, সে-কথাটা বোধ হয় আর ব্যাখ্যা করিয়া না বলিলেও চলে। সংসারের গৃহকর্ম্মে নারীর যে কাজ, উহা যে কি করিয়া কোন্‌দিক দিয়া কবে এত ছোট ও হেয় হইয়া গেল—ভাবিয়া স্থির করা দুষ্কর। শিক্ষিতসম্প্রদায়ের অনেককেই আজকাল এই বাট্‌না-বাটা ও কুট্‌না-কুটার নামে নাসিকাকুঞ্চন করিতে দেখি বটে, কিন্তু আবার ইঁহাদেরই অনেককেই দেখি, যদি কার্য্যোপলক্ষ্যে প্রবাসে যাইয়া কখনও মেসে বা বোর্ডিংএ থাকিতে বাধ্য হন,

ইহাদের অভাবজনিত দুঃখেই দিন-দিন কতই না 'হা-হতোস্মি' ও দীর্ঘনিশ্বাসের ছড়াছড়িও করিয়া ফেলেন। ছাত্রবাবাজীরা দিন দিন মেসের ঠাকুরের বাপান্ত করার দায় হইতে মুক্ত হইয়া ছুটির অবকাশে যেইদিন গৃহাভিমুখে ছুটেন, এই তুচ্ছ নগণ্য কাজগুলির সুখস্মৃতি মনে বহন করিয়াই সেইদিন তাহাদেরও দেখিনা কত স্ফূর্ত্তি, কত আনন্দ, কতই-না তাহাদের সরল ও সহর্ষ ভাব! যে বস্তুগুলির সাময়িক অভাবেই এত দুঃখ, এত আমাদের অভাববোধ, বাঙ্গালীর সংসার হইতে সত্যসত্য সেই জিনিষগুলি কোনও দিন চিরনির্ব্বাসিত বা তাড়িত হইয়া গেলে, সে আমাদের বস্তুতঃ দুঃখের দিন আসিবে, না আনন্দের দিন আসিবে? কিন্তু এই বাটনা বাটা, কুটনা-কুটা ও রন্ধন প্রভৃতি কার্য্যকে প্রকারান্তরে বঙ্কিমবাবু-ই আবার একটা যথার্থ আবশ্যকীয় সামগ্রী বলিয়াও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, (আমাদের ৩ ও ৪ নম্বর চিহ্নিত তাঁহার উক্তিগুলি দেখুন)। তাঁহার এই উক্তিগুলির সঙ্গে তাঁহার ২নং দফার উক্তিগুলি মিলাইয়া দেখিলে, এই গৃহকর্ম্ম সম্বন্ধীয় তাঁহার প্রকৃত মনো ভাবটা যে কি —সত্যসত্য বুঝিয়া উঠিতে কষ্ট হয়। মনে হয়, ইহাই তিনি কহিতে চাহিয়াছেন যে, গৃহকর্ম্ম আবশ্যকীয় কার্য্য বটে, কিন্তু এই বাটনা-বাটা কুটনা-কুটা ও রন্ধনকার্য্যগুলি বড় বাড়াবাড়ি, এগুলিকে বাদ দিতে পারিলেই ভাল, এগুলি নারীরা না-ই বা করিলেন! বাকী যে-সব গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম আছে সেইগুলিই যথেষ্ট—সেইগুলিই শ্রেয়ঃ ও কর্ত্তব্য; সুতরাং সেইগুলিই তাঁহারা করিবেন এবং তদ্‌সঙ্গে ফুরসৎমত অর্থোপার্জ্জনার্থে বাহিরের কাজকর্ম্ম যাহা পারেন সম্ভবমত করিবেন। ব্যবস্থা করাটা সহজ হইল বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ কথাগুলি শেষপর্য্যন্ত কোথায় গিয়া দাঁড়াইল—ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। আচ্ছা, প্রথমতঃ আমাদের নিম্নস্তরের গরীব-দুঃখী রমণীদের

কথাই ধরা যাক্। পেটের দায়ে ইহারা গতর খাটাইয়া জীবিকার্জ্জন করে, ঘরে-বাইরে সর্ব্বত্র এক ঐ জলতোলা বাটনাবাটা, কুটনা-কুটা—এইগুলি সর্ব্বত্রই তাহাদিগকে করিতে হয়—উপায় নাই। ইহাদের নিকট এ পরামর্শ চলিবে না। অতঃপর, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। ইহাদেরও দাসদাসী রাখিবার উপায় নাই, নিজের ঘরে নিজেরা এইসব না করেন তো—অপরে আর কে আসিয়া করিবে? সুতরাং তাহাদিগকেও এইগুলি করিতেই হইবে। যদি বলা যায়, ইহারা নিজেরা এইসব না করিয়া বাহিরে রোজগারের চেষ্টা দেখিয়া রোজগারের পয়সায় দাসদাসী রাখিয়া এইসব কার্য্য করাইতে পারেন, তথাপি প্রশ্ন—তাহাদিগকে তো তবে সেই বাবুদের অবস্থায়ই পড়িতে হইল। সর্ব্বদা বাহিরেই আবদ্ধ থাকিতে হইবে; অপর গৃহকর্ম্মগুলি কে করে? তাহাদের ছেলেপিলে রাখে কে? হাটবাজার কে গুছায়? মালপত্তর কে আগলায়? অতিথি-অভ্যাগতকে কে অভ্যর্থনা করে? পীড়িতের সেবাশুশ্রূষা কে করে? আর সর্ব্বোপরি, তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষারই বা কিসে পথ হয়? এইসবের বিশৃঙ্খলায় যে ক্ষতি হইবে, মাহিয়ানার অর্থে তাহার পূরণ হইবে কি? নৈতিক বা আধ্যাত্মিক ক্ষতির কথা ছাড়িয়াই দিলাম, কিন্তু অর্থের দিক দিয়া যে ক্ষতি হইবে, তাহারও পূরণ হইবে কি?

তারপর বড়ঘরের কথা। যাঁহারা বড়লোক, তাঁহারা—বঙ্কিমবাবুর নিজের কথানুযায়ীই—এসব কাজ নিজেরা কখনও করেন না। সুতরাং এই সামাজিক অত্যাচারটা তাঁহাদিগকে বড় স্পর্শ করে না। কিন্তু এইসব শ্রমসাধ্য কার্য্যগুলি না করার দরুণ তাঁহাদেরও যে কি লাভ হয়—যথার্থ লাভ হয় কি অনিষ্টই ঘটে—একথাটাও বিবেচ্য। বড়লোকের স্ত্রী-কন্যারা অর্থোপার্জ্জনের জন্য যে বাহিরে কোনও শ্রমসাধ্য কাজ

করিতে যাইবেন, সে-সম্ভাবনা অল্প। বড়জোর ঘরের বাহিরে তাঁহারা সভাসমিতি করিয়া বেড়াইতে পারেন, বা বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী নিমন্ত্রণরক্ষা, থিয়েটার-বায়োস্কোপ-দর্শন, একটু মাঠ-ময়দানে পাইচারী করা বা হাওয়া-খাওয়া—এইগুলি করিতে পারেন। কিন্তু চাকুরীই করুন বা ঐগুলিই করুন, পৌরজনের আহারাদির সুব্যবস্থা, নিজের এবং সন্তান-সন্ততির স্বাস্থ্যরক্ষার পথ—এইগুলি আসিবে কোথা হইতে? বঙ্কিমবাবু নিজেই অনুযোগ করিয়া কহিয়াছেন, এই পরিশ্রমসাধ্য গৃহকর্ম্মগুলি না করার দরুণই দিনদিন আমাদিগের নবীনাদিগের ও তাহাদের সন্তান-সন্ততিদের স্বাস্থ্যক্ষয় হইতেছে, লাবণ্য হারাইতেছে—আরও কত কি (৩নং দফা দেখুন)। এই বাটুনা-বাটা, কুটুনা-কুটা, জলতোলা ও রন্ধনাদি ব্যতীত সংসারে এমন আর কি কাজ আছে, যার সহায়তায় সত্যসত্যই ঐগুলি রক্ষা পাইতে পারে? যদি সংসারের অপর সকল কার্য্য করিয়াও, রমণীরা এই কার্য্যগুলিতেই বিমুখ হন, প্রকৃত দুঃখ তাহাতে বিদূরিত হইবে কি? আহার-বিহারে ত্রুটি, স্বাস্থ্যহানি, সংসারে বিশৃঙ্খলা, কিছু-না-কিছু তাঁহাদের গৃহে ঢুকিবেই। আমাদের এমন দিন আজও আসে নাই যে, রমণীরা সত্যসত্য ঘোড়ায় চড়িয়া পলো খেলিতে যাইবেন বা ক্লাব খুলিয়া টেনিস্ বা ব্যাড্মিণ্টন খেলার চর্চ্চা করিবেন। আর যদিবা সেদিন কখন আসেও, সেদিনেও গৃহস্থালীর শৃঙ্খলা বা আহার্য্যের পবিত্রতা রক্ষার্থেও অন্ততঃ ওই রন্ধন কার্য্যটীকে আবশ্যক হইবেই—ঐটীকে বাদ দিলে চলিবে না। স্বরন্ধনের অনেক-গুণ—কে না একথাটা স্বীকার করিবেন?

সতীত্ব ও পাতিব্রত্যের গণ্ডী কতটুকু?

(ঘ) এইবার বঙ্কিমবাবুর আর একটা গুরুতর অভিযোগে আসিয়াছি। বঙ্কিমবাবু নব্যাদের ধর্ম্মের শিথিলতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অনেক তীব্র

কথা কহিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি পাশ্চাত্যনীতির গৌরবরক্ষার্থে, হিন্দুর 'সতীত্ব' ও 'পাতিব্রত্যের' আদর্শ দুইটাকে একটু যেন খাটো করিয়াই ফেলিতে চাহিয়াছেন। স্বামী যে স্ত্রীর নিকট 'দেবতার দেবতা' হইবেন বা স্ত্রী স্বামীকে দাসীভাবে সেবা করিবে—এইটী তাঁহার নিকট অযৌক্তিক। দ্রৌপদী যে পাতিব্রত্যের সাধনায়, স্বপত্নীসেবাতেও আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন—ইহাতে তিনি বড় ক্ষুণ্ণ। লিখিয়াছেন—"দাসীত্ব এতদূর যে—স্বামীর সন্তোষার্থে সপত্নীগণেরও তিনি পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন"—(৬দফা দেখুন)। পুনঃ এক জায়গায় (১নং দফা) এইভাবটীও ব্যক্ত করিয়াছেন যে, পুরুষ নিজের প্রয়োজনেই 'সতীত্ব'-টাকে এত বড় করিয়া তুলিয়াছে ; যেন, এ জিনিষটা এত বড় সামগ্রী কখনই হইতে পারিত না, যদি-না পুরুষের প্রয়োজনীয়তা ও দায়টা সত্যসত্য এত বড় হইত। কথাটা বড় বিস্ময়ের ; কেননা—অন্যত্র তিনিই আবার নব্যাদের এই বলিয়াও তিরস্কার করিয়াছেন যে, পাতিব্রত্য প্রচীনাদিগের যেমন অস্থি-মজ্জা-শোণিতে প্রবিষ্ট ছিল, তাহাদের মধ্যে তেমন নয় (৫নং দফা)। বঙ্কিমবাবুর এই 'নবীনা ও প্রবীণা' প্রবন্ধটা বাস্তবিকই কিছুটা হেয়ালি। পাশ্চাত্যসভ্যতার আদর্শে আমাদের 'পাতিব্রত্য' ও 'সতীত্ব'টাকে আমাদের প্রাচ্য আদর্শের গণ্ডী হইতে অনেক দূরে তিনি সরাইয়া লইয়া যাইতে প্রস্তুত সুরু। অথচ বরাবর চলিয়াছেন ঠিক উল্টোমুখো। তাঁহার যুক্তিতর্ক ও দৃষ্টান্তগুলি সর্ব্বদা তাঁহার ওই লক্ষ্যটার বিপরীতদিকেই গতি করিয়া চলিয়াছে। প্রাচীনকে ভাঙ্গিয়া নূতন গড়িতে গিয়া পদে পদে সেই প্রাচীনের শ্রেষ্ঠতাটাকেই তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মত ব্যক্ত করিয়াছেন বটে—ইংরেজী শিক্ষার গুণে নব্যাদের কিছুটা উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু সে উন্নতিটাকে যুক্তির বাঁধনে বাঁধিতে পারেন নাই। বরং প্রবীণাই যে পদে পদে তাঁহাদিগকে পেছনে ফেলিয়া

রাখিয়াছে—এই ভাবটাই ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে সর্ব্বত্র। বঙ্কিমবাবু প্রাচীনা ও নবীনার তুলনা করিতে যাইয়া সর্ব্বত্র দেখাইয়াছেন—কি স্বাস্থ্যে, কি কর্ম্মপটুতায়, কি লাবণ্যে, কি ধর্ম্মে [illegible] প্রাচীণাই নবীনা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু অপর কথা এখন থাক্—এইবা[illegible] 'পাতিব্রত্য' ও 'সতীত্ব'টা সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর নিজের মনের কোণের [illegible] কথাটা যে কি, তাহাই আমরা বুঝিতে চেষ্টা পাইব।

দাসীত্ববর্জ্জিত পাতিব্রত্য ও সতীত্ব

এবিষয়ে বঙ্কিমবাবুর মনোগতভাবটী যতটা আমরা বুঝিয়াছি, তাহা বোধ হয় এই যে, 'পাতিব্রত্য' ও 'সতীত্ব'—এই দুইটী জিনিষই খুব ভাল ও প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকটীরই পরিমাণ থাকা চাই। 'পাতিব্রত্য' বস্তুটা দাসীত্বভাববর্জ্জিত হইবে, আর ওই 'সতীত্ব'টাকেও প্রধানতঃ নারীর নিজের প্রয়োজনানুরূপই প্রশ্রয় দিতে হইবে—পুরুষের ভালমন্দের দিকে এজন্য তত তাকাইবার দরকার নাই। অর্থাৎ নিজের সুবিধা-অসুবিধার জন্য যতটা 'সতী' হওয়ার দরকার, নারী ততটুকুই 'সতী' হইবেন, পুরুষের ভালমন্দ দেখিতে গিয়া নিজের সুখস্বাচ্ছন্দের প্রতি চির-অন্ধ হইয়া তাহাতেই যে একনিষ্ঠ হইয়া থাকিবেন—এমন যেন না হয়। অর্থাৎ এককথায়—দরকার পড়িলে আমাদের দেশের কুললক্ষ্মীরাও মেমসাহেবদের মতই স্বামী পরিত্যাগ করিয়া পুনর্বিবাহ করিতে পারিবেন এবং স্বামীর [illegible]হিত পাওয়ানা-দেনার একটা হিসাব রাখিয়া তবেই তাঁহাকে তদনুযায়ী ভালবাসা দিবেন, সেবা-যত্ন করিবেন, তাঁহার ওপর প্রেম ও ভক্তিশ্রদ্ধা ছড়াইবেন।

কথাগুলি বঙ্কিমবাবু ঠিক এমনভাবে বিশ্লেষণ করিয়া না বলিলেও

এসম্পর্কে দু'একটী কথা তিনি যাহা বলিয়াছেন, উহাদের মর্ম্ম ও ভাব একান্তই ঐ রূপ। ওই দাসীত্বভাববর্জ্জন কথাটার মানেই অবিসম্বাদিতরূপে এই যে—স্বামীর জন্য আর যাহাই নারী করুন, অন্ধভাবে কখনও তাঁহার হুকুমের চাকর হইবেন না, পতির ঘর-রাখিতে গিয়া নিজের মানসম্ভ্রম খাটো করিবেন না, নিজের লাভালাভের খবরটা না লইয়া কেবলমাত্র তাঁহার সুখান্বেষণেই ব্যস্ত হইয়া ছুটিবেন না। স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য সপত্নীগণের যে সেবা করা—বঙ্কিমবাবুর চক্ষে এটা'ও একটা প্রকাণ্ড দাসীত্ব—কেননা, উহাতে স্বামী সন্তুষ্ট হন বটে, সংসারেও হয়ত শান্তি আসে, কিন্তু তা'র নিজের আত্মমর্য্যাদাটি যথার্থ খাটো হইয়া যায়। স্বামী বহু বিবাহ করিলে পত্নী যে তথাপি অন্যপরা না হইয়া কেবলমাত্র ঐ এক-পতিতেই অনুরক্তা থাকিবেন—এমন বাধ্যবাধকতাটাও ওই দাসীত্বভাবটারই হুবহু রূপান্তর; কেননা, ওইখানেও তাহাকে দাসীর মতই অপরের ইচ্ছায় তাহার ন্যায্যপ্রাপ্য মনুষ্যত্বের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হয়; অপরের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার নিজের সুখ-শান্তি, সৌভাগ্য-সম্পদ্ ও মানসম্ভ্রমের কথাটা ভুলিয়া যাইতে হয়।

ত্যাগ চাইনা, অধিকার চাই—চুলচেড়া ভাগ চাই।

মোটকথা, ত্যাগ চাই না, অধিকার চাই! স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও সমানাধিকারের ও স্বাধীনতার একটা ভাগাভাগি আবশ্যক; একের ভাগে অন্যের পা না-দেওয়া আবশ্যক এবং এক কারবারের দুই সরিকের মতই, স্থূলতঃ উভয়ে এক হইলেও মূলতঃ যে পরস্পর পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র—এইভাবটা মনে রাখিয়া সকল কাজ করা কর্ত্তব্য।

স্বামী-স্ত্রী ভাগের সরিক নয় কেন

বলা বাহুল্য, এগুলিও সেই পাশ্চাত্যসভ্যতারই হুবহু প্রতিচ্ছবি। আমাদের প্রাচ্যের আদর্শ এরূপ নহে। এসংসারে স্বামী-স্ত্রীকে আমরা এক কারবারের দুই সরিক বলিয়াই ভাবি না, একদেহের দুইটী অঙ্গ যেমন পরস্পরের উপর পরস্পর নির্ভরশীল, এককে হারাইয়া অপরে অসহায়, একের পুষ্টিতে অপরের পুষ্টি, একের পতনে অপরের পতন—হিন্দুসমাজে স্বামী-স্ত্রীর আদর্শটাও ঐরূপ। এ আদর্শে নন্‌-কো-অপারেশনের বা অসহযোগিতার স্থান নাই, উদরের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া মস্তিষ্ক তার ভাত মারিতে চায় না; বা হীনবল বাঁ-হাতের প্রতি ঈর্ষা করিয়া ডানহাত তাহাকে বিপদকালে রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায় না, বা এক পা অবসন্ন—বাতপঙ্গু হইয়া গেলে অন্য পা তাহাকে বহন করিতে অসম্মত হয় না। আমাদের বিবাহের মন্ত্রগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেও এসত্যটা বেশ উপলব্ধি করা যায়।—

"যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥"

—এই যে তোমার হৃদয় উহা আমার হৌক, এই যে আমার হৃদয়, এহৃদয় তোমার হৌক।

আর শাস্ত্রেও দেখি তাই—

"যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্।
নার্দ্ধং প্রজায়তে সর্ব্বং প্রজায়েতেত্যপি শ্রুতিঃ॥" (ব্যাস)

—যে পর্য্যন্ত দারগ্রহণ না হয় সেপর্য্যন্ত পুরুষ অর্দ্ধাবস্থায় মাত্র থাকেন। শ্রুতি বলেন—এই অর্দ্ধাবস্থা নিষ্ফল, পূর্ণাবস্থাই ফলপ্রসূ।

"অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য, ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমা সখা।"

(মহাভারত)

—মানুষের অর্দ্ধই পত্নী, পত্নীই সর্ব্বাপেক্ষা মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ সখা।

আমাদের এই আদর্শে পতি-পত্নীর সুখ-স্বার্থ কখনই স্বতন্ত্র নহে—এক। পতি বা পত্নী—ইহারা প্রত্যেকে একাকী এক-একটী খণ্ডমানুষ মাত্র, উহাদের একত্রমিলনেই এক-একটী সম্পূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গবিশিষ্ট মানবের বিকাশ, আর এইরূপ এক-একটী পূর্ণাঙ্গবিশিষ্ট মানবের যুক্তাধিকারেই পতিপত্নীর যতকিছু শক্তি, সাধনা, স্বাধীনতা ও অধিকার। এককভাবে, কি স্বামী, কি স্ত্রী, কেহই উহাদিগকে আয়ত্তও করিতে পারেন না, বা উহাদিগকে ভোগ করিতেও পারেন না। কিন্তু পাশ্চাত্য আদর্শটী ইহার বিপরীত। উহার হিসাবে, স্বামী ও স্ত্রী লমূতঃ স্বতন্ত্র, এবং কাজে-কাজেই স্বামী-স্ত্রীর সুখ-দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা ও অধিকার—উহারাও স্বতন্ত্র। এখন, এই আদর্শ দুইটীর মধ্যে বস্তুতঃ শ্রেষ্ঠ কোন্‌টী?

হিন্দু-আদর্শে 'পাতিব্রত্য' ও 'সতীত্ব'

বঙ্কিমবাবু এই দুই প্রবন্ধে 'সতীত্ব' ও 'পাতিব্রত্য'র কথায় ওই পাশ্চাত্য-আদর্শটার প্রতিই অধিকতর পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন—একথা অস্বীকার করা সুকঠিন; কিন্তু তাঁহার এ হিসাবটী ন্যায়সঙ্গত কি অমূলক?

এবিষয়ে আমাদের মতামতটা আমরা আমাদের "সতীধর্ম্ম" পুস্তকের কতিপয় অংশ উদ্ধৃত করিয়া এইখানে দেখাইতে চেষ্টা করিব। এই 'সতীধর্ম্মে' আমরা লিখিয়াছি—

"হিন্দুমাত্রই একথা স্বীকার করেন যে, বিবাহের প্রধান প্রয়োজনীয়তা ধর্ম্মসাধনের নিমিত্ত। বেদব্যাস কহিয়াছেন—'ব্রহ্মা কোনকালে একদেহ

দুইভাগে বিভক্ত করেন, তাহাতে পূর্ব্বার্দ্ধভাগদ্বারা পতিগণের সৃষ্টি হয়, পরার্দ্ধভাগদ্বারা পত্নীগণ সৃষ্ট হন—ইহা শ্রুতির কথা। যেপর্য্যন্ত পুরুষ পত্নীলাভ করিতে না পারে, তাবৎ অপূর্ণ থাকে।”

“পতি-পত্নী উভয়েই অর্দ্ধাংশ-পরিমিত। এককে ছাড়িয়া অপরে সম্পূর্ণ হইতে পারে না; সম্পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত না হইলে মোক্ষাদিরূপ গুরুতর অভীষ্টসাধনও সহজ নয়। সুতরাং জীবনের সর্ব্বপ্রধান কাম্যলাভ করিতে গেলে স্ত্রী-পুরুষের মিলন আবশ্যক। আবার সে-মিলন যেমন-তেমন মিলন হইলে চলিবে না। তুচ্ছ দেহের মিলন বা সাংসারিক অবান্তর কার্য্যের ভিতর যে মিলন—তাহাতে পরমার্থলাভের উপায় হয় না। ধর্ম্মপথের সাথী চাই। ধর্ম্মসাধনে স্ত্রী-পুরুষকে এক হইতে হইবে; সুতরাং মনের ঐকান্তিক একনিষ্ঠ মিলন আবশ্যক। পরমার্থের চেষ্টায় কোন্ পথে যাইতে হইবে—সে-বিষয় লইয়া উভয়ের মধ্যে মতভেদ হইল তো সকল পণ্ড হইল। সেরূপ মতভেদ বা অনৈক্য না থাকা চাই। অন্যভাব থাকিলে একের জন্য অন্যের উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। জ্ঞান বল, বল বল, উদ্যম বল—প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায়—পুরুষ অগ্রগামী ও সবল; স্ত্রীলোক অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল; পুরুষের স্ত্রী-অনুবর্ত্তী হওয়া অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পুরুষানুবর্ত্তিনী হওয়াই কল্যাণকর। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ তাই, স্ত্রীর ধর্ম্মকে পুরুষের ধর্ম্মেই নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছেন, এবং এই কারণেই স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটাকে নানা কঠোর বিধান ও আইন-কানুনের প্যাঁচে ফেলিয়া এতাদৃশ কঠোর ও গুরুতর করিয়া তুলিয়াছেন; এমন কি, শেষটা ইহাও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে—শুধু পতির ধর্ম্ম ব্যতীত পত্নীর যে অন্য ধর্ম্ম নাই তাহা নহে, পতিসেবাই তাঁহাদের একমাত্র ধর্ম্ম, এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মান্তর নাই, পতি ব্যতীত তাঁহাদের অন্য দেবতাও নাই।”

"আধুনিক পাশ্চাত্যসভ্যদেশগুলিতে পাতিব্রত্য ও সতীত্বের উদ্দেশ্য—সহধর্ম্মিণীত্বের সার্থকতা নয়। * * কাজেকাজেই প্রকাণ্ড প্রভেদ। পাশ্চাত্যদেশগুলিতে পাতিব্রত্য ও সতীত্বের প্রয়োজনীয়তা—সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের সৌকর্য্যার্থে, এবং অনেকস্থলে সৃষ্টিকে রক্ষা ও প্রবলতর করিবার উদ্দেশে মাত্র। * * পরলোক আছে কি নাই, সেখানকার সম্বল কিছু কিছু লইতে হইবে কি না—এসব নিয়া চিন্তা-ভাবনা বা মাথা-ঘামাঘামির প্রয়োজন সে-সব দেশে প্রায় নাই; সুতরাং গুছাইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্যই—বিবাহ বল, স্ত্রী বল, পাতিব্রত্য বা সতীত্ব বল—তাঁহাদের এইগুলির প্রয়োজন।"

"সমাজ বন্ধনও আমাদের ঐরূপ নয়, আর আমাদের আদর্শটীও ভিন্ন প্রকারের।"

"বাস্তবিক, স্ত্রীজাতিকে এই সহধর্ম্মিণীত্বব্রতে একনিষ্ঠ করিবার জন্যই পাতিব্রত্য, সতীত্ব প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রীধর্ম্মের আবশ্যকতা হইয়াছে, এবং এইজন্যই শাস্ত্রকারগণ সমস্ত স্ত্রীধর্ম্মটীকে এইসূত্রেই গাঁথিয়াছেন। স্ত্রী-লোকের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য যাহা-কিছু নির্দ্ধারিত হইয়াছে—এই মহৎ ও দুর্লভ লক্ষ্যটীকে অনুসরণ করিয়া। * * এইজন্যই হিন্দুবিবাহের গ্রন্থি এত দৃঢ়; এইজন্যই বিবাহকে হিন্দু শুধু ইহকালের একটা অস্থায়ী বন্ধনমাত্রই মনে করেন না, পরন্তু জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ বলিয়াই মানিয়া লন, এবং সেইভাবেই স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হন। কি গৃহস্থালীর কার্য্যে, কি ধর্ম্মসাধনে, কি অনূঢ়াবস্থায়, কি বৈধব্যজীবনে, সেইজন্যই দেখি—নারীর লক্ষ্য, কর্ত্তব্য ও সাধনা সেই একইমুখী—কি করিয়া ভর্ত্তার সহিত এক হইবেন, কি করিয়া ভর্ত্তার কার্য্যে, ভর্ত্তার উদ্দেশ্যে, ভর্ত্তার কর্ত্তব্যে সাহচর্য্য করিবেন। সেইজন্যই দেখি, শাস্ত্রে * * রহিয়াছে—

যত্রানুকূল্যঃ দম্পত্যোস্ত্রিবর্গ স্তত্র বর্দ্ধতে
মৃত জীবতি বা পত্যৌ যা নান্যমুপগচ্ছতি
সেহকীর্ত্তিমবাপ্নোতি মোদতে চোময়া সহ ॥ (যাজ্ঞবল্ক্য)

—পতিপত্নীর মধ্যে অনুকূলভাব বিদ্যমান থাকিলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গপ্রাপ্তি হয়। আর স্বামীর জীবিতাবস্থায়ই হৌক বা মৃত্যুর পরই হৌক, যে-স্ত্রী পুরুষান্তরে আসক্ত না হয়, সে ইহকালে যশস্বিনী হয় এবং পরকালে উমার আনন্দময় সঙ্গ লাভ করে।"

"স্ত্রীলোকের, সহধর্ম্মিণীত্ব লাভ করিতে গেলে, একনিষ্ঠ পাতিব্রত্যের দরকার; সেই পাতিব্রত্য লাভ ও চিররক্ষা করিবার জন্য সতীত্বের প্রয়োজন। সতীত্বরূপ পরমাস্ত্র যাঁহার নাই, তিনি এই অমূল্যনিধি আয়ত্ত করিতে বা আয়ত্ত করিয়া রক্ষা করিতে পারিবেন কেন? সুতরাং নারী-জীবন সার্থক করিতে হইলে এ মহা-অস্ত্রটী চাই-ই।"

"যোদ্ধার পক্ষে অস্ত্র যেরূপ, কামারের পক্ষে হাতুড়ি যেরূপ, চিকিৎসকের পক্ষে ঔষধি যেরূপ, অন্ধের পক্ষে যষ্টি যেরূপ, স্ত্রীলোকের পক্ষে সতীত্বও সেইরূপ। সতীত্ব না থাকিলে কোনও পাকা সাধনা হয় না। সতীত্বহীন পাতিব্রত্য তাসের ঘর মাত্র—কোন্ মুহূর্ত্তে কিসের আঘাতে অদৃশ্য হইয়া যায় স্থিরতা নাই। পাতিব্রত্যকে পাকাভাবে লাভ করিতে হইলে—সতীত্ব চাই। মন ও শরীরকে সুস্থ, সবল ও সতেজ করিতে হইলে—সতীত্ব চাই। মান-মর্য্যাদা, ধর্ম্ম ও পুণ্য সঞ্চয় করিতে হইলে—এই সতীত্বকে দরকার। সুতরাং, সতীত্ব নারীর পরমসম্পদ্।"

"পাতিব্রত্য রক্ষার ছোট-বড় আরও অনেক স্তম্ভ আছে, যথা—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সদাচার, সংযম, সারল্য, প্রেম, নিপুণ-গৃহস্থালী, হিতাহিত-

জ্ঞান, কর্ত্তব্যানুরাগ, ধর্ম্ম-বুদ্ধি ইত্যাদি। এইগুলি না হইলে গৃহরক্ষা হয় না ; গৃহরক্ষা না হইলে পতির সাধনায় বিঘ্ন আসে। এইগুলিকেও যথাসাধ্য আয়ত্ত করিয়া নিপুণভাবে গৃহ-সংসার রক্ষা করিলে, নারী তবেই সাফল্যলাভ করে।"

"এইগুলি যে-উপায়ে লাভ ও রক্ষা করা যায়, সে-চেষ্টাই করিতে হইবে। মান্ধাতার আমলে যে-উপায়ে লাভ হইত সে-উপায় এইক্ষণ না চলে ত, বর্ত্তমানে যে-উপায় উপযোগী তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে—ইহাতে ধর্ম্ম নষ্ট হয় না। * * শাস্ত্রেরও এই নির্দ্দেশ—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

লোকাচার বা দেশাচারের পরিবর্ত্তন নিষিদ্ধ নয়

আমাদের এই শেষোক্ত বাক্যটী হইতে দেখা যাইবে যে, মূললক্ষ্যটী ঠিক রাখিয়া, কালোপযোগী দেশাচারের বা লোকাচারের পরিবর্ত্তনের পথে আমরাও বিরোধী নহি। বঙ্কিমবাবুর এই কথাগুলির আলোচনা এমন সবিস্তারভাবে এইজন্য আমরা এখানে করিলাম যে, বস্তুতঃ তাঁহার প্রবর্ত্তিত ও উত্থাপিত এই নারীর অধিকার ও স্বাধীনতামূলক সমস্যা দুইটী আজ পর্য্যন্তও আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রকার নারীসমস্যার মূল হইয়া রহিয়াছে। এই দুইটী প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়াই আজপর্য্যন্ত এ-দেশে ঐসম্বন্ধে যত গোলমাল ও তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে ; এবং মনে হয়, যদি এ দুইটী বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির হয়, অপর ছোট-বড় সকল সমস্যার সম্পর্কেই কোন-না-কোন সুমীমাংসায় সত্বর আসা যাইবে। এই দীর্ঘ আলোচনার মারফত আজ আমরা শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের 'কোনও কালের কতগুলি কথারই' এইখানে জবাব দেই নাই, পরন্তু এদেশে বর্ত্তমানে যে

নারীর কর্ম্মযোগঘটিত একটা তুমুল আন্দোলন চলিতেছে তদ্‌সংক্রান্ত দুই-চারিটা বড় বড় অভিযোগ ও তর্ক-বিতর্কের সম্পর্কে আমাদের যাহা বক্তব্য—উহারও অনেকটা এই ফাঁকে নিবেদন করিয়া লইলাম।

বঙ্কিমচন্দ্রের সংশোধিত মতবাদ

"বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও-কালের কতকগুলি কথা"—এইজন্য আমরা বলিলাম যে—"নবীনা ও প্রবীণা" এবং "সাম্য" প্রবন্ধদ্বয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে-মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, পূর্ব্বাপর উহারই যে তিনি পক্ষপাতী ছিলেন, এমনও দেখা যায় না। তাঁহার পরবর্ত্তীকালের লেখা "কৃষ্ণচরিত্র" ও "ধর্ম্মতত্ত্ব" প্রভৃতি পাঠ করিলে স্পষ্টই এইবোধ হয় যে, প্রাচ্য সাহিত্যের সংশ্রবে আসিয়া পরবর্ত্তীকালে এসব বিষয়ে তাঁহার মতের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল এবং এই নারী-বিষয়ক প্রশ্নগুলি সম্বন্ধেও তাঁহার অনেক ধারণাই আশ্চর্য্যরকম তখন উল্টাইয়া-পাল্টাইয়াও গিয়াছিল।

এমন একটা আশ্চর্য্য-পরিবর্ত্তন সত্যসত্যই যে তাঁহার জীবনে আসিয়াছিল এবং এজন্য বস্তুতঃই যে তাঁহার পরবর্ত্তীকালের ওই আর্য্য-শাস্ত্র-চর্চ্চা ও সংস্কৃতসাহিত্যসেবাই প্রধানতঃ দায়ী ছিল—উহার প্রমাণস্বরূপ তাঁহার নিজের লেখা হইতেই এইখানে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতে চাই।

'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমবাবুর 'দ্রৌপদী' নামক প্রবন্ধের প্রথম-প্রস্তাব বাহির হওয়ার পরে, উহার প্রায় ১০ বৎসর অন্তর, পুনঃ উক্ত-বিষয়ক তাঁহার দ্বিতীয় প্রস্তাব বাহির হয়। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন যে—

পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণের মহাপাতক

"ইউরোপীয় আচার্য্যবর্গের আর কোন সাধ্য থাকুক আর না থাকুক, এদেশ সম্বন্ধে সোজা কথাগুলা বলিতে তাঁহারা বড় মজবুত! ইউরোপীয়েরা

এদেশীয় প্রাচীন গ্রন্থসকল কিরূপে বুঝেন, তদ্বিষয়ে আমাকে সম্প্রতি কিছু অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, সংস্কৃত-সাহিত্যবিষয়ে তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কৃত বেদ, স্মৃতি, দর্শন পুরাণ, ইতিহাস, কাব্যপ্রভৃতির অনুবাদ, টীকা, সমালোচন পাঠ করার অপেক্ষা গুরুতর মহাপাতক সাহিত্যজগতে আর কিছুই হইতে পারে না। আর মূর্খতা উপস্থিত করিবার এমন সহজ উপায়ও আর কিছুই নাই। এখনও অনেক বাঙ্গালী তাহা পাঠ করেন, তাঁহাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য এ কথাটা কতক অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমি লিখিতে বাধ্য হইলাম।"

'ধর্ম্মতত্ত্বে' নারীপুরুষের অধিকার ও বৈষম্য

পাঠক-পাঠিকা "নবীনা ও প্রবীণা" এবং "সাম্য" প্রবন্ধদ্বয়ে নারীধর্ম্ম-বিষয়ে বঙ্কিমবাবুর মতামত পাইয়াছেন, এখন "ধর্ম্মতত্ত্বে" ঐসম্বন্ধেই তিনি আবার কি বলিতেছেন শুনুন :—

"গুরু। অপত্যপ্রীতিসম্বন্ধে যাহা বলিলাম, দম্পতিপ্রীতি সম্বন্ধেও তাহা বলা যায়। অর্থাৎ (১) স্ত্রীর প্রতিপালন ও রক্ষণের ভার তোমার উপর। স্ত্রী নিজে আত্মরক্ষণে ও প্রতিপালনে অক্ষম; অতএব তাহা তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। স্ত্রীর পালন ও রক্ষণ ব্যতীত প্রজার বিলোপ-সম্ভাবনা, এজন্য তৎপালন ও রক্ষণ জন্য স্বামীর প্রাণপাত করাও ধর্ম্মসঙ্গত। (২) স্বামীর পালন ও রক্ষণ স্ত্রীর সাধ্য নহে। কিন্তু তাঁহার সেবা ও সুখসাধন তাঁহার সাধ্য। তাহাই তাঁহার ধর্ম্ম। অন্যধর্ম্ম অসম্পূর্ণ, হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ, হিন্দুধর্ম্মে স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলিয়াছে। যদি দম্পতিপ্রীতিকে পাশববৃত্তিতে পরিণত না করা হয়, তবে ইহাই স্ত্রীর যোগ্য নাম; তিনি স্বামীর ধর্ম্মের সহায়। অতএব স্বামীর সেবা, সুখ-

সাধন ও ধর্ম্মের সহায়তা, ইহাই স্ত্রীর ধর্ম্ম। (৩) জগৎরক্ষার্থ এবং ধর্ম্মাচরণের জন্য দম্পতিপ্রীতি। তাহা স্মরণ রাখিয়া এই প্রীতির অনুসরণ করিলে ইহাও নিষ্কামধর্ম্মে পরিণত হইতে পারে ও হওয়াই উচিৎ। নহিলে ইহা নিষ্কামধর্ম্ম নয়।

*　　*　　*　　*

"শিষ্য। * * কামবৃত্তিই সৃষ্টিরক্ষার উপায়। দম্পতিপ্রীতি ব্যতীত ইহার দ্বারাই জগৎ রক্ষিত হইতে পারে * * *।

"গুরু। * * দম্পতিপ্রীতি ব্যতীত কেবল পাশববৃত্তিতে জগৎরক্ষা হইতে পারে না।

"শিষ্য। পশুসৃষ্টি ত কেবল তদ্দ্বারাই রক্ষিত হইয়া থাকে।

"গুরু। পশুসৃষ্টি রক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু মনুষ্যসৃষ্টি রক্ষা হইতে পারে না। কারণ, পশুদিগের স্ত্রীদিগের আত্মরক্ষার ও আত্মপালনের শক্তি আছে; মনুষ্যস্ত্রীর তাহা নাই। অতএব মনুষ্যজাতির মধ্যে পুরুষদ্বারা স্ত্রীজাতির পালন ও রক্ষণ না হইলে, স্ত্রীজাতির বিলোপের সম্ভাবনা। * * ধর্ম্মাচরণ জন্য সমাজ আবশ্যক, সমাজ ভিন্ন জ্ঞানোন্নতি নাই, জ্ঞানোন্নতি ভিন্ন ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান সম্ভবে না। * * * সমাজগঠনের পক্ষে একটী প্রথমপ্রয়োজন বিবাহপ্রথা; বিবাহপ্রথার স্থূলমর্ম্ম এই যে, স্ত্রীপুরুষ এক হইয়া সাংসারিক ব্যাপার ভাগে নির্ব্বাহ করিবে। যাহার যাহা যোগ্য, সে সেই ভাগের ভারপ্রাপ্ত। পুরুষের ভাগ—পালন ও রক্ষণ। স্ত্রী অন্যভারপ্রাপ্ত, পালন ও রক্ষণে সক্ষম হইলেও বিরত। বহুপুরুষপরম্পরায় ঐরূপ বিরতি ও অনভ্যাস বশতঃ সামাজিক নারী আত্মপালনে ও রক্ষণে অক্ষম। এ অবস্থায় পুরুষ স্ত্রীপালন ও রক্ষণ না করিলে অবশ্য স্ত্রীজাতির বিলোপ ঘটিবে। অথচ যদি পুনশ্চ তাহাদিগের সে শক্তি পুনরভ্যাসে পুরুষপরম্পরা উপস্থিত হইতে পারে, এমন কথা বল, তবে বিবাহপ্রথর

বিলোপ এবং সমাজও বিনষ্ট না হইলে, তাহার সম্ভবনা নাই, ইহাও বলিতে হইবে।

"শিষ্য। তবে পাশ্চাত্যেরা যে স্ত্রী-পুরুষের সাম্য স্থাপন করিতে চাহেন, সেটা সামাজিক বিড়ম্বনা মাত্র ?

"গুরু। সাম্য কি সম্ভবে ? পুরুষে কি প্রসব করিতে পারে, না শিশুকে স্তন্যপান করাইতে পারে ? পক্ষান্তরে, স্ত্রীলোকের পল্টন লইয়া লড়াই চলে কি ?

"শিষ্য। তবে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনের কথা যে পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে খাটে না ?

"গুরু। কেন খাটিবে না ? যাহার যে শক্তি আছে, সে তাহার অনুশীলন করিবে। স্ত্রীলোকের যুদ্ধ করিবার শক্তি থাকে, অনুশীলিত করুক ; পুরুষের স্তনপান করাইবার শক্তি থাকে, অনুশীলিত করুক্।

"শিষ্য। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকেরা ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক-ছোড়া প্রভৃতি পৌরুষ কর্ম্মে পটুতা লাভ করিয়া থাকে।

"গুরু। অভ্যাসজনিত বিকৃত দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এসকল বিচার না করিয়া উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিলেই ভাল হয়। যাক্, এ-তত্ত্ব যে-টুকু আবশ্যক, তাহা বলা গেল।"

'কৃষ্ণচরিত্রে' নারী-স্বাধীনতার বিচার

তারপর 'কৃষ্ণচরিত্রে'ও নারীর স্বাধীনতার বহরটা আরও কিরূপ নামিয়া আসিল দেখুন। সুভদ্রাহরণের প্রসঙ্গে বঙ্কিমবাবু কহিতেছেন—

"যদি পনের বৎসরের কোনও হিন্দুর মেয়ে কোন সুপাত্রে আপত্তি

উপস্থিত করে, তবে কোন্ পিতামাতা জোর করিয়া তাহাকে সৎপাত্রস্থ করিতে আপত্তি করিবেন? জোর করিয়া বালিকা-কন্যা সৎপাত্রস্থ করিলে তিনি কি নিন্দনীয় হইবেন? যদি না হন, তবে সুভদ্রাহরণে কৃষ্ণের অনুমতি নিন্দনীয় কেন?"

'বিলাতী মাপকাঠী' ও 'একব্বরি গজ'

তারপর তিনি প্রসঙ্গশেষে আবার কহিতেছেন—

"আমরা এইতত্ত্ব এত সবিস্তারে লিখিলাম, তাহার কারণ আছে। সুভদ্রাহরণের জন্য কৃষ্ণদ্বেষীরা কৃষ্ণকে কখনও গালি দেন নাই। তজ্জন্য কৃষ্ণপক্ষ সমর্থনের কোনও আবশ্যকতা ছিল না। আমার দেখাইবার উদ্দেশ্য এই যে, বিলাত হইতে যে ছোট মাপকাঠীটি আমরা ধার করিয়া আনিয়াছি, সে-মাপকাঠীতে মাপিলে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষাগত অতুল সম্পত্তি অধিকাংশই বাজে-আপ্ত হইয়া যাইবে। আমাদিগের সেই একব্বরি গজ বাহির করা চাই।"

বঙ্কিমবাবুর এইসব উত্তরকালীন মতবাদের সঙ্গে আমাদের নিজস্ব মতগুলির বেশী কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয় না, আর এইগুলিই যে তাঁর পরিণত কালের সংশোধিত মতবাদ—সে-বিষয়েও সংশয় নাই। তথাপি, সরাসরি তাঁহার এই কথাগুলিকে উপস্থিত না করিয়া, তাঁহার ওই বাতিলকরা কথাগুলিকে লইয়াই পূর্ব্বাহ্নে যে এত হেস্তনেস্ত কেন করিলাম, তাহার উত্তর এই যে—বঙ্কিমবাবুর মত লোক—যিনি এককালে স্বয়ং ওই পাশ্চাত্য প্রভাবের বিরুদ্ধে এইপ্রকার অভিযান করিয়াছিলেন, তিনিও কোনকালে ইহার কুহকে পড়িয়াই আমাদের অনেকের ন্যায়ই দিশাহারা হইয়াছিলেন, এবং পরে আবার বিষয়টীকে আয়ত্ত করিয়া তিনিই আমাদের সেই প্রাচীন আর্য্য-আদর্শটীতেই যে অনুরক্ত হইয়াছিলেন—এই

ভাঙ্গাগড়ার দিনে ইহাও একটা পরমশিক্ষার বস্তু। অতুলপ্রতিভাশালী দিগ্বিজয়ী বঙ্কিমের এই ভ্রান্তিমূলক সাময়িক বিক্ষেপ ও তাঁহার পরবর্ত্তী পুনরাবর্ত্তের ইতিহাসটা আমাদের অনেক অন্ধসংস্কারকের চক্ষুও ফিরাইয়া আনিয়া দিবে না কি ?

চলিত যুগের কথা

আমরা বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গে পাশ্চাত্যসভ্যতার আদিযুগের ভাবটার কথঞ্চিৎ বিচার-বিবেচনা করিলাম, এইবার বর্ত্তমানকালের ভাবধারার সম্পর্কেও দু'একটা কথা বলা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি। বঙ্কিমের যুগ হইতে এপর্য্যন্ত এই পাশ্চাত্য ভাবধারার অগ্রগতিটী প্রায় একটানা ভাবেই চলিয়া আসিতেছে, এবং নারীসমস্যা সম্পর্কে আমাদের মূলবিবাদের ক্ষেত্র-গুলিও প্রায় একপ্রকারই রহিয়াছে। সেই নারীর স্বাধীনতা ও সমানাধিকার লইয়াই আজ পর্য্যন্তও আমাদের মধ্যে যত বাদ-বিতণ্ডা—যত মতভেদ। নানা-কারণে এই আন্দোলন-আস্ফালনটা আজকাল আরও তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে—এইমাত্র বিশেষত্ব। সুতরাং এপর্য্যন্ত আমরা ঐ দুইটী বিষয়ে যাহা কিছু বলিয়াছি, বর্ত্তমানকালেও উল্লিখিত আন্দোলনটী সম্পর্কে ঐ কথাগুলিই যে পর্য্যাপ্ত—সেবিষয়েও ভুল নাই। মূলবিষয়ের সমর্থনে আর কিছু নূতন কথার, বা আত্মসমর্থনে নূতন যুক্তিতর্কের অবতারণা না করিলেও চলে। তথাপি, এই বর্ত্তমানযুগে যাঁহারা এই পাশ্চাত্য মন্ত্রের হোতা বা পুরোহিত, আত্মপক্ষসমর্থনকল্পে যে-সব ভ্রান্তিপূর্ণ যুক্তিতর্কের তাঁহারা আশ্রয় গ্রহণ করেন, উহাদেরও কিছু কিছু প্রতিবাদ আবশ্যক। কেননা, তাঁহাদের মধ্যে এমন শক্তিশালী লোকও অনেক আছেন যাঁহাদের শুধুমাত্র কথাটুকুই তাঁহাদের দেশজোড়া নামের জোরে ও কীর্ত্তির মাহাত্ম্যে সাধারণলোকসমাজে পরমসমাদৃত হয় এবং অযৌক্তিক হইলেও সত্য বলিয়া পরিচিত হইতে বাধা পায় না। যেখানে সমাজের মঙ্গলামঙ্গলের

প্রতি লক্ষ্য, সেখানে এজাতীয় কোনও অন্ধনির্ভরতার অবকাশ যাহাতে না ঘটে, সে-পক্ষেও চেষ্টা করা অবশ্যই কর্ত্তব্য।

শরচ্চন্দ্র ও নারীসমস্যা

বোধ হয়, বর্ত্তমান যুগে আমাদের দেশপূজ্য সাহিত্যিক শরচ্চন্দ্রই বাঙ্গালাদেশে এই জাতীয় পুরোহিতদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী। নারীর সুখদুঃখ সম্বন্ধে বস্তুতঃই শরচ্চন্দ্র অনেক ভাবিয়াছেন, এবং বোধ হয় তিনিই একটা বদ্ধ কালা ও অন্ধ সমাজকে অনেকক্ষেত্রে উহাদের সম্বন্ধে অনেক অশ্রুতপূর্ব্ব বাণী ও উলঙ্গরূপের চিত্র উপহার দিয়া জোর করিয়া সে-সম্বন্ধে উহাকে সচেতন ও জাগরূক করিয়াছেন। তাঁহার এ দান পাইয়া সমাজ অবশ্যই অনেক উপকৃত ও লাভবান হইয়াছে, কিন্তু মনে হয়, নারীর অগ্রগতি সম্বন্ধে ভবিষ্যতের পথ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া এপর্য্যন্ত তিনি যাহা বলিয়াছেন বা এখনও বলেন, বিলাতী মাপ-কাঠীর হিসাবে অনেকটা উহা সত্য হইলেও আমাদের একব্বরি গজের মাপে নিশ্চিত খাটো ও ক্ষুদ্রপরিসর বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। বাঙ্গলা ১৩৩৮ সনের ১লা আশ্বিনের "নবশক্তি-শরৎসংখ্যা"য় তাঁহার লিখিত 'স্বরাজ-সাধনায় নারী' নামক প্রবন্ধটী (যাহা শিবপুর-ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের নিকট কোনও একসভায় তিনি পাঠ করিয়াছিলেন) হইতে আমাদের একথাটা আমরা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব· এবং আদিযুগের অগ্রবর্ত্তী দলের প্রতীক্ বঙ্কিমবাবুর পরে নবযুগের অগ্রবর্ত্তী-দলের প্রতীক্ এই শরচ্চন্দ্রের কথাগুলির আলোচনা সঙ্গেসঙ্গেই আমাদের এই আশুদায়িত্বেরও উপসংহার হইবে বলিয়া মনে করি।

শরৎবাবু আমাদের পরমশ্রদ্ধার পাত্র, আর ব্যক্তিগতভাবেও এগ্রন্থকার তাঁহার নিকট বড় ঋণী ; তা'ছাড়া তাঁহার মনীষা ও সাহিত্যিক প্রতিভার উপরে আমাদেরও যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি আছে—বোধ হয় অপর কাহারও

অপেক্ষা তাহা একচুল কম নয়। সুতরাং নিজেদের বিবেক-বুদ্ধির পরিচালনায় ও দেশপ্রীতি বশতঃ এই জটিল সামাজিক সমস্যাটীর ক্ষেত্রে আজ যদি সত্যসত্যই তাঁহার সহিত আমরা একমত হইতে না পারি বা এজন্য তাঁহার কোন কোন কথার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হই, আশা করি, এজন্য কেহ (এমন কি, শরৎবাবু নিজেও) আমাদিগকে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা-সম্পন্ন বা কোনভাবে তাঁহার প্রতিষ্ঠালাঘবকল্পে ব্রতী বা চেষ্টিত মনে করিয়া ভুল করিবেন না।

শরৎবাবুর প্রবন্ধটী প্রথমে যেদিন পাঠ করি, সেই দিন উহার কোন কোন অংশে দাগ কাটিয়া পার্শ্বে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্তব্য লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল, কোনও দিন পুনঃ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে এসব বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্নাদি করিব—কোনও দিন লিখিতভাবে ইহাদিগকে প্রকাশ করিব এমন কল্পনা ছিল না। কিন্তু প্রসঙ্গাধীন দায়ে পড়িয়া এপথে আমাদিগকে পদার্পণ করিতেই হইল। যাহা হউক এদায় রক্ষার্থে এইখানে শুধু উদ্ধৃত অংশগুলির নীচে, বন্ধনীচিহ্নমধ্যে, উহাদিগের সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্যগুলি যথাসম্ভব সংক্ষেপে সন্নিবেশিত করিয়াই আজ আমরা ক্ষান্ত হইব—ইহাই মনে করিয়াছি। এতদপেক্ষা বিস্তৃত আলোচনার স্থান এগ্রন্থে নাই, আর আবশ্যকতাও হয়ত অল্প—এসম্বন্ধে আমাদিগের যাহা বক্তব্য, প্রসঙ্গান্তরে ইতিপূর্ব্বেই তো তাহা বলা হইয়া গিয়াছে। আর আরও একটা বিশেষ কথা এই যে, যাঁহাকে অনেক শ্রদ্ধাঞ্জলিই দেওয়ার আছে, তাঁহাকে তাঁহার সেই ন্যায্য পাওনার কিছু না দিয়া আজ শুধুমাত্র এই একটু প্রতিবাদই উপহার দিলাম—এই ব্যবস্থাটাও কেমন আমার ঠিক মনঃপূত হইয়া উঠিতেছে না। যাহা হউক, শরৎবাবুর কথাগুলি এই—

'সতীত্ব' কি 'মনুষ্যত্বে'র পরিপন্থী?

"* * আজ যাঁরা স্বরাজ পাবার জন্যে মাথা খুড়ে মরছেন—আমিও তাঁদের একজন। কিন্তু আমার অন্তর্য্যামী কিছুতেই আমায় ভরসা দিচ্ছে না। * * যে চেষ্টায় যে আয়োজনে দেশের মেয়েদের যোগ নেই, সহানুভূতি নেই, এই সত্য উপলব্ধি করবার কোনও জ্ঞান, কোন শিক্ষা, কোন সাহস আজ পর্য্যন্ত যাদের দিই নি, তাদের কেবল গৃহের অবরোধে বসিয়ে শুদ্ধমাত্র চরকা কাটতে বাধ্য করেই এত বড় বস্তু লাভ করা যাবে না। মেয়েমানুষকে আমরা যে কেবল মেয়ে করেই রেখেছি, মানুষ হতে দিই নি, স্বরাজের আগে তার প্রায়শ্চিত্ত দেশের হওয়া চাই-ই। অত্যন্ত স্বার্থের খাতিরে যেদেশ যেদিন থেকে কেবল তার সতীত্বটাকেই বড় করে দেখেচে, তার মনুষ্যত্বের কোনও খেয়াল করেনি, তার দেনা আগে তাকে শেষ করতেই হবে!

"এইখানে একটা আপত্তি উঠতে পারে যে, নারীর পক্ষে সতীত্ব জিনিষটা তুচ্ছও নয়, এবং দেশের লোক তাঁদের মা-বোন-মেয়েকে সাধ করে যে ছোট করে রেখেচে তাও ত সম্ভব নয়। সতীত্বকে আমিও তুচ্ছ বলিনে কিন্তু একেই তার নারী-জীবনের চরম ও পরম শ্রেয়ঃ জ্ঞান করাকেও কুসংস্কার মনে করি। কারণ, মানুষের মানুষ হবার যে স্বাভাবিক এবং সত্যিকার দাবী একে ফাঁকি দিয়ে যে কেউ যে-কোন একটা কিছুকে বড় করে খাড়া করতে গেছে, সে তাকেও ঠকিয়েছে নিজেও ঠকেছে। তাকেও মানুষ হতে দেয় নি, নিজের মনুষ্যত্বকেও তেমনি অজ্ঞাতসারে ছোট করে ফেলেচে। একথা [illegible] মন্দ চেষ্টায় করলেও সত্য, তার ভাল চেষ্টায় করলেও সত্য।"

(শুধু নারী মানুষ হয়নি বলেই যে স্বরাজ পাবো না, তা নয়, পুরুষকেও তো মানুষ হতে হবে। 'সতীত্ব'কে চরম ক'রে দেখা কি মেয়েদের মানুষ হবার

পথে পরিপন্থী? মেয়েদের মানুষ হবার পক্ষে কিভাবে এটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে? অবরোধ-প্রথা আর সতীত্ব এক নয়; দয়া-মায়া সে কাকেও ভুলিয়ে দেয় না, পরোপকারের পথে বিঘ্ন আনে না, দেশ-সেবায় আঁচল ধরে কাকেও টানে না—তার সাক্ষী পদ্মিনী, তার সাক্ষী মহামায়া, তার সাক্ষী চাঁদবিবি, তার সাক্ষী অহল্যাবাই। তাঁরা সকলেই সতীত্বটাকে এমনই চরম করে দেখ্‌তেন। মানুষ হবার এমন কোন্ দাবীটাকে আমরা অনাহুত আজ ফাঁকি দিয়ে 'সতীত্বটাকে' সত্যিকার প্রয়োজনীয়তার বাইরেও বড় করে তুলেছি? মনুষ্যত্বের খেয়াল হয় ত পুরোপুরি ভাবে আমরা করিনি, কিন্তু তার জন্যে ওই 'সতীত্বটা'কে বড় করে দেখাই যে দায়ী হলো—কে বলে? ঐ 'সতীত্ব'টাকে বড় করে দেখাও যে ওই মনুষ্যত্বেরই একটা অঙ্গ। মনুষ্যত্বের সকলখানিই সতীত্ব নয় ঠিক্, কিন্তু 'সতীত্ব'কে বাদ দিয়েও মনুষ্যত্ব নয়।)

শুধু স্ত্রী-স্বাধীনতায়ই স্বরাজ আসিবে না

শরচ্চন্দ্র আরও বলিয়াছেন—

"আমার মনে হয়, মেয়েদের অধিকার যারা যে পরিমাণে খর্ব্ব করেছে, ঠিক সেই অনুপাতেই তারা, কি সামাজিক, কি আর্থিক, কি নৈতিক, সকল দিক দিয়েই ছোট হয়ে গেছে। এর উল্টো দিকটাও আবার এমনি সত্য। অর্থাৎ, যে জাতি যে পরিমাণে তার সংশয় ও অবিশ্বাস বর্জ্জন কর্ত্তে সক্ষম হয়েছে, নারীর মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা যারা যে পরিমাণে মুক্ত করে দিয়েছে,—নিজেদের অধীনতা-শৃঙ্খলও তাদের তেমনি ঝড়ে গেছে। ইতিহাসের দিকে চেয়ে দেখ। পৃথিবীতে এমন একটা দেশ পাওয়া যাবে না যারা মেয়েদের মানুষ হবার স্বাধীনতা হরণ

করেনি অথচ তাদের মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা অপর কোনও প্রবল জাত কেড়ে নিয়ে জোর করে রাখ্‌তে পেরেচে। কোথাও পারেনি,—পারতে পারেও না, ভগবানের বোধ হয় তা আইনই নয়।"

(মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা ও অধিকার নারী-পুরুষ উভয়েরই প্রাপ্য, কিন্তু নারীর এই স্বাধীনতা ও অধিকারটার সত্যরূপটা কি? গলদ ওইখানেই। তা কেউ ভাল করে, বিচার করে, স্পষ্ট করে বলে দেন না। সংশয় ও অবিশ্বাস সব স্থানেই কি পরিত্যাগ করা চলে? সংসারটা আজও তত স্বর্গতুল্য হয়ে উঠে নি। রাষ্ট্রবন্ধন, সমাজবন্ধন, ধর্ম্ম-বন্ধন—তাদের সকলের মূলেই যে ঐ এক কথা—সংশয় ও অবিশ্বাস। ইতিহাস কি সাক্ষ্য দেয়? শুধু নারীর অবাধ স্বাধীনতার বলেই কোন দেশ মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা পায় নি। যাদের লক্ষ্য করে এসিদ্ধান্তটা নির্ব্বিচারে আমরা মেনে নিচ্ছি সেই অবাধ নারী স্বাধীনতার লীলাভূমি ইউরোপের নানাদেশের ইতিহাসেও কি দেখ্‌তে পাই? ফরাসীবিপ্লব হ'তেই ইউরোপে স্ত্রীস্বাধীনতার প্রবর্ত্তন। পূর্ব্বেকার কথা বাদ দিই, কিন্তু তারপর? বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্তও মধ্য-ইউরোপের অবস্থা কি ছিল—নারী স্বাধীনতা কতটুকু তাকে এগিয়ে নিয়েছিল? *

---

* The year 1850 did not seem one of good augury for the progress of free political institutions on the European continent. The spirit of the national party of Hungary appeared to be crushed. Foreign occupation and intervention were once more triumphant over the greater part of Italy. The hopes which German populations had been forming of a United Germany, under the leadership of Prussia, appeared to be blighted. Prussia had fallen to be a mere dependent or creature now of Austria and now of

তারপর আরও একটা কথা, মেয়েদের আমরাই কি শুধু মেয়ে করে রেখেছি? মিশর, চীন, কোরিয়া, মেসোপটেমিয়া, আরব—এদের অবস্থাও কি আমাদের মতই বা ততোধিক শোচনীয় নয়? মিশর * আর চীন—অনেকটা আমাদেরই মত; কোরিয়া, মেসোপটেমিয়া ও আরবের মেয়েদের অবস্থা এসব দেশ হতে যে বিশেষ কিছু উন্নত—একথাও কেউ বলবে না। কিন্তু এখনো এসব দেশে এসুরটা তেমন করে বেজে উঠেনি। এরাও আমাদের মতই স্বরাজ-সাধনায়

Russia. The manner in which Prussian politics were made subservient to the intrigues of Russia filled the heart of many a patriotic German with anger and despair. * * In the domestic Government of almost all the Continental States an iron despotism, a rigid police system reigned supreme."—EPOCHS OF MODERN HISTORY (1830–1850), by Justin Mc Carthy.

* "The greatest blot upon Egyptian character is the position accorded to their women, who, as in all Mohammedan countries, are considered to be soulless. From infancy employed in the most menial occupations, they are not even permitted to enter the mosques at prayer-time, and until recently the scanty education which the boys enjoyed was denied to their sisters." -EGYPT, by R. Talbot Kelly.

"Li fell in love with the 17 year-old daughter of a widow living at Pinghu, near Shanghai, and a marriage was arranged through the medium of a go-between....On the wedding day, Li's prospective mother-in-law saw him for the first time, fell in love with him, and urged him to marry her as well. He agreed. So the elder woman became wife No. 2, and her daughter rules the house as wife No. 1."—Reuter. (Advance, Aug, 24, 1935).

রত; আর বোধ হয়, অনেক মাথা-ওয়ালা নেতা তাঁদেরও হাল ধরে রয়েছেন, কিন্তু মেয়েদের মেয়ে করে রেখেচে বলেই যে তাঁদের এ সাধনা নিতান্তই পণ্ড হবে বা স্বরাজলাভের আগে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁদের করতেই হবে—অন্ততঃ একথা বলে কেউ বসে আছেন বা তাঁদের অন্তর্য্যামী তাঁদের হুসিয়ার করে দিয়েছেন, তা দেখতে পাইনে। আর, এই 'মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা' ও রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা—এ দু'টাই কি এক বস্তু? শুধু রাষ্ট্রিক স্বাধীনতায়ই কি 'মনুষ্যত্ব' এসে যায়, আর মেয়েদের স্বাধীনতার অনুপাতেই দেশের নৈতিক ও সামাজিক উন্নতি-অবনতি উঠা-নাবা করে? আর কিছুরই প্রয়োজন নেই?—সমাজ-বন্ধন, ধর্ম্মের অনুশাসন—সব বাহুল্য?—পথে এদের ডিঙ্গিয়ে ও পদদলিত করে যেতে হলে, তাই যেতে হবে? সম্প্রতি ইউরোপের স্ত্রী-স্বাধীনতার সেরা লীলাভূমি রাশিয়া, ও এসিয়ার সেরা স্বাধীন রাজ্য জাপান সম্বন্ধে খবরের কাগজের মারফত যে দু'একটা সেরা খবর এসে আমাদের নিকটে পৌঁছেছে, তা'দিয়েও ঐসব দেশে এই 'মনুষ্যত্ব' এবং নৈতিক ও সামাজিক উন্নতির বহরটা এই স্ত্রী-স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা মূলে কতখানি কেমন বিস্তৃতি লাভ করেছে—তা বেশ বোঝা যায়।

"The Government organ "Izvesta" sharply criticises the high divorce rate and the large number of fictitious marriages in Moscow asserting that it is high time to declare that lightmindedness in family affairs is a crime and insult to the morality of the socialist regime."—(ADVANCE, Aug. 18, 1932).

অর্থাৎ রাশিয়ার রাজধানী মস্কোনগরীটীতে সম্প্রতি বিবাহ-বাতিলের ও অযথা-বিবাহবন্ধনের সংখ্যাটা অত্যন্তই বেড়ে গেছে; আর তা দেখে সেদেশের সরকারী তরফের কাগজ Izvesta তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে

বলছেন—পারিবারিক ব্যাপারে এসব হাল্‌কামির ভাবটা তাঁদের সমাজ-তান্ত্রিক শাসনের পক্ষে ঘোরতর অপরাধজনক ও গ্লানিকর—একথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করার আজ সময় উপস্থিত হয়েচে। অথচ, এসম্পর্কে মজার কথাটা এই যে—রাশিয়ার এই নরনারীদের এপথে চলবার পথ মুক্ত করে দিয়েছেন কিন্তু এঁরাই—এই সমাজতান্ত্রিক দেশশাসকগণ,—দেশে সেভাবে আইন ক'রে—দেশের সর্ব্বপ্রকার ভালমন্দ প্রাচীন বিধি-বিধানগুলিকে একবারেই নির্ব্বিচারে জীয়ন্তে গোর দিয়ে! যাক্—এবার জাপানের কথাটা শোনা যাক্—

"One out of every ten marriages in Japan—and one is contracted every minute—ends in divorce, according to statistics compiled by the Ministry of Home Affairs. This rate is said to be second only to that of the United States. Divorce cases come to the courts at an average rate of 140 a day, or a little more than five every hour"—(ADVANCE, Aug. 18, 1935).

তার মানে—নব্য সভ্য জাপানীদেরও ঐ হাল। তাদের সরকারী 'হোম' বিভাগের আদম-সুমারীতে প্রকাশ—তাদের দেশেও প্রতি মিনিটে একটা করে বিবাহ হচ্চে, আর এরকম দশটা বিবাহের অন্ততঃ একটার শেষ পরিণতি হচ্চে ঐ বিবাহবিচ্ছেদে। বিবাহবিচ্ছেদের এমন ভারী তালিকা একমাত্র মার্কিণদেশ (ঐ মেয়োবিবির পুণ্যদেশ—বুঝ্‌লেন তো?) ব্যতীত আর কোথাও নাকি ইদানীং দেখা যায় না। আর এরকম বিবাহবিচ্ছেদের মামলা সেদেশের আদালতে উপস্থিত হচ্ছে—ঘণ্টায় ৫টী বা দৈনিক ১৪০টী হিসাবে!

এখন জিজ্ঞাস্য, এঁদের এই নৈতিক উন্নতিটাকে লক্ষ্যই করেআজ

আমাদেরও 'দুর্গা' ব'লে ঝুলে পড়তে হবে কি? এপ্রসঙ্গে স্বর্গীয় মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার একটা কথা আজ কিন্তু ভারী মনে পড়ছে। একবার কোন একসভাতে রহস্য করে তিনি বলেছিলেন—"যে-কোন উপায়ে এবং যে-কোন পথেই স্বরাজলাভ করতে হয় তো, তার একটা ভারী সহজ ও অব্যর্থ উপায় আমার হাতে আছে,—আমি আপনাদিগকে বলে দিতে পারি। আপনারা ব্যাটাছেলেরা আজ হতে মেম বিয়ে করতে সুরু করুন, আর আপনাদের মেয়েদেরও নির্ব্বিচারে ইউরোপীয়ানদের হাতে পাত্রস্থা করতে লেগে যান, আর কিছু করতে হবে না; আপনাদের সন্তান-সন্ততিগণ ও নাতিনাতনীরা আপনা হতেই অতঃপর দিব্য সাহেববিবি হয়ে গড়ে উঠেচেন দেখতে পাবেন, আর সঙ্গে সঙ্গে স্বরাজটাও দেখতে পাবেন নির্ঘাৎ আপনাদের হাতে এসে গেচে।"

মনুষ্যত্বের 'চিচিঙ্ফাঁক্' খুঁজতে গিয়ে, ঘুরে ফিরে শেষটা তবে কি আমাদিগকেও নির্ব্বিচারে আজ এমনই একটা সহজ সরলপথ বরণ করে নিতে হবে?

অবাধ স্বাধীনতা না পরিমিত স্বাধীনতা?

তিনি আরও বলেন—

"কেউ যদি বলেন, কিন্তু এই এসিয়ায় এমন দেশও ত আজও আছে মেয়েদের স্বাধীনতা যারা এক তিল দেয়নি, অথচ তাদের স্বাধীনতাও ত কেউ অপহরণ করেনি; অপহরণ কর্ব্বেই এমন কথা স্বপ্নেও বলিনি। তবুও আমি একথা বলি, স্বাধীনতা যে আজও আছে সে কেবল নিতান্তই দৈবাতের বলে। এই দৈববলের অভাবে যদি কখনও বস্ত যায়, ত আমাদেরই মত কেবলমাত্র দেশের পুরুষের দল কাঁধ দিয়ে এ মহাভার সূচ্যগ্রও নড়াতে পার্ব্বে না।"

(এটা কাল-মাহাত্ম্যেরফল—নিত্য সত্যবস্তু নয় নিশ্চয়। বর্ত্তমানে সাময়িকভাবে অবস্থা অনেকটা এরূপই দাঁড়িয়েছে বটে, কিন্তু চিরকালই এরূপ ছিল না, বা থাক্‌বে যে, এমন কোন নিশ্চয়তাও নেই। সাময়িক অবস্থাবিভ্রাটে সামাজিক সকল ব্যবস্থারই অদল-বদল হতে পারে না। শিখ-রাজ্য, মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্য স্ত্রী-স্বাধীনতা মূলে স্থাপিতও হয় নি, তার অভাবে যায়ও নি। প্রাচীনকালে স্ত্রী-স্বাধীনতা বহুদেশেই ছিল না, কিন্তু সে-সব দেশের অনেক জাত দিগ্বিজয়ও করে গেছে এবং তাদের সাম্রাজ্যও যুগ-যুগান্ত চলেছিল ; আর বর্ত্তমানযুগেও দেখি, যাঁরা যে-পরিমাণে স্ত্রীস্বাধীনতা দিয়েছেন তাঁরাই যে সে-পরিমাণে বীর্য্যবিক্রমশালী হয়ে উঠেচেন—একথাটীও ঠিক নয়। বিগত মহাযুদ্ধের কাল পর্য্যন্তও জর্ম্মাণীর মেয়েদের অবস্থা কি ছিল? অবাধ স্বাধীনতা তাঁরা ভোগ করেন নি, বেশীর ভাগ গৃহকর্ম্ম নিয়েই থাকতেন, আর বাহিরের কাজে পুরুষদের সঙ্গে ভাগ বসাতেও যান নি। * কিন্তু তাতে কি ক্ষতি হয়েছিল? মেয়েদের স্বাধীনতার দ্বার আরও অনেকগুণ বেশী মুক্ত ক'রে দিয়েও ইংরেজ বা ফরাসী—জর্ম্মাণদের পেছনে ফেলে ছুট্‌তে পারেন নি। কি শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে, কি বলবিক্রমে, কি পারিবারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যে প্রায় সকলদিকেই জর্ম্মাণেরাই অনেকদূর তাদের পিছনে ফেলে চলেছে। আবার পক্ষান্তরে, এই ইউরোপেরই পোল্যাণ্ড, ফিন্‌ল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, বোহেমিয়াতেও দেখি, মেয়েদের স্বাধীনতার উপর কোন প্রকার হাত না দিয়েও, আজপর্য্যন্ত তাদের পুরুষের দল তেমনই অসহায়—তেমনই পরমুখাপেক্ষী। একথায় কেউ কেউ হয়ত বলবেন—এদের কথা স্বতন্ত্র,

* "The Germans are great family people and home-lovers. Home comes first, and most Germans believe that a woman should look after her home and children and not bother her head about outside affairs."—LANDS AND PEOPLES, Page 1980.

এদের আকারও তেমন নয়, আর অবস্থাদির গুণেও ভারী তাঁরা পঙ্গু। কিন্তু এসম্পর্কে জার্ম্মেণী, ইটালী, অষ্ট্রিয়া ও বল্কান-অঞ্চলটীর আদি-ইতিহাসগুলিও বিবেচ্য। তাদের ছোট ছোট রাজ্যগুলিরও এককালে এই অবস্থাই ছিল, কিন্তু আজ তাঁরা উঠেচে—তাঁদের পুরুষের দলই কাঁধ দিয়ে তাঁদের উঠিয়েছে। সুতরাং শরৎবাবুর একথাটা মান্য মনে হয় না। তবে মনুষ্যত্বের দাবীর দিক থেকে ন্যায্য স্ত্রী-স্বাধীনতার যে একটা নিত্য-প্রয়োজনীয়তা আছে, তা মানি; তবু সেটা অবাধ স্বাধীনতা হবে, তা মানিনে; লক্ষ্য তার সুনির্দ্দিষ্ট চাই, আর দেশ, কাল ও পাত্রানুযায়ী তার আকারটীও চাই।)

ব্রহ্ম-নারী সতীত্বের ফেটিস্ ছাড়িয়াছে, কিন্তু অনেক কিছু পাইয়াছে; সত্য কি?

শরচ্চন্দ্র পুনঃ বলিয়াছেন—

"শুধু আপাতঃ-দৃষ্টিতে এই সত্যের ব্যত্যয় দেখি ব্রহ্মদেশে। আজ সে দেশ পরাধীন। একদিন সেদেশে নারীর স্বাধীনতার অবধি ছিল না। কিন্তু যেদিন থেকে পুরুষ এই স্বাধীনতার মর্য্যাদা লঙ্ঘন কর্ত্তে আরম্ভ করেছিল, সেই দিন থেকে একদিকে যেমন নিজেরাও অকর্ম্মণ্য, বিলাসী এবং হীন হতে সুরু করেছিল, অন্যদিকে তেম্‌নি নারীর মধ্যেও স্বেচ্ছাচারিতার প্রবাহ আরম্ভ হয়েছিল। আর সেইদিন থেকেই দেশে অধঃপতনের সূচনা। * * তাদের অনেক গেছে, কিন্তু একটা ব জিনিষ আজও হারায়নি। কেবলমাত্র নারীর সতীত্বটাকে একটা ফেটিস্ করে তুলে তাদের স্বাধীনতা তাদের ভাল হবার পথটাকে কণ্টকাকীর্ণ কোরে তোলেনি। তাই আজও দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, আজও দেশের ধর্ম্মকর্ম্ম, আজও দেশের আচার-ব্যবহার মেয়েদের হাতে। আজও তাদের মেয়েরা

একশতের মধ্যে নব্বুই জন লিখ্‌তে পড়তে জানে, এবং তাই আজও তাদের দেশ থেকে আমাদের এই হতভাগ্য দেশের মত আনন্দ জিনিষটা একবারে নির্ব্বাসিত হয়ে যায় নি। আজ তাদের সমস্ত দেশ অজ্ঞতা, জড়তা ও মোহের আবরণে আচ্ছন্ন হয়ে আছে সত্য, কিন্তু একদিন যেদিন তাদের ঘুম ভাঙ্গবে, এই সমবেত নরনারী একদিন যেদিন চোখমেলে জেগে উঠবে, সেদিন এদের অধীনতার শৃঙ্খল, তা সে যত মোটা এবং যত ভারীই হোক্, খসে পড়তে মূহূর্ত্ত বিলম্ব হবে না, তাতে বাধা দেয় এমন শক্তিমান কেউ নেই।"

(ব্রহ্মদেশে, নারীর স্বাধীনতার মর্য্যাদা পুরুষই প্রথমে লঙ্ঘন করলে কি করে? কি করেছিল তারা—কোন্‌দিক দিয়ে নারীর স্বাধীনতায় হাত দিয়েছিল? আর তার ফলে নারী আরো স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে উঠলো কেন,—কি করে? যার স্বাধীনতা কমে যায়, তার স্বেচ্ছচারিতাই বা বাড়ে কি করে? নারী স্বেচ্ছাচারিণী হলো, দেশের অধঃপতন এলো, অনেক কিছুই গেলো, কিন্তু তবু দেখা যাচ্ছে, নারী তার ভাল হবার পথটীকে তখনো কণ্টকাকীর্ণ করে তুলেনি—কিসের বলে? শুদ্ধ ঐ সতীত্বটাকে ফেটিস্ করে' তুলে নি—এই গুণে! এই গুণে তারা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য পেলো, আনন্দ পেলো, নব্বুইজন লেখাপড়াও শিখ্‌লে, কিন্তু তবু আজ সমস্ত দেশটাই অজ্ঞতা, জড়তা ও মোহের আবরণে আচ্ছন্ন হয়ে আছে—এটাও একটা পরম বিস্ময়! এই অজ্ঞতা, জড়তা ও মোহ—এলোই বা কি সূত্রে, আর যাবেই বা কখন কোন্ পথে? তাদের এ ঘুম কে ভাঙ্গাবে? ব্রহ্মনারী শিক্ষিতা হয়েছে, ব্যবসা কচ্চে, আনন্দ ছড়াচ্ছে—সবই ঠিক, কিন্তু দেশটাকে একবিন্দুও আজপর্য্যন্ত ঠেলে উঠাতে পারে নি তো? পুরুষদের একটুও মানুষ কর্ত্তে পারে নি তো? এত ব্যবসা-বাণিজ্য করছে কিন্তু ঘরের লক্ষ্মী বাইরে চলে যাচ্ছেন! ভাল হবার এত বড় একটা নিষ্কণ্টক

পথ পেয়েও, এত বড় একটা বড়-জিনিষ না হারিয়েও—কি হলো তাদের ? ঘুম ভাঙ্গলে অবশ্য কেউ তাদের রোখ্‌তে পার্ব্বেনা, লক্ষ মণ লোহার শিকলও এক মুহূর্ত্তেই খসে পড়বে শুনলুম—কিন্তু এসবের লক্ষণ কই ?)

যে যা দাবী করে তাই দাও ?

তারপর তিনি আরও বলেন—

"* * এইখানেই একটা বস্তুকে আমি তোমাদের চিরজীবনের পরম সত্য বলে অবলম্বন করতে অনুরোধ করি। এ কেবল পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা। যার যা দাবী তাকে তা' পেতে দাও ; তা' সে যেখানে এবং যারই হোক্। * * আমি বলি, যদি মেয়ে মানুষ মানুষ হয়, এবং স্বাধীনতায়, ধর্ম্মে জ্ঞানে যদি মানুষের দাবী আছে স্বীকার করি ত এদাবী আমাকে মঞ্জুর করতেই হবে, তা সে ফল তার যাই হোক। হাড়ি ডোমকে যদি মানুষ বলতে বাধ্য হই, এবং মানুষের উন্নতি করবার অধিকার আছে এ যদি মানি, তাকে পথ ছেড়ে আমাকে দিতেই হবে, তা' সে যেখানেই গিয়ে পৌঁছোক্।"

(দাবীমাত্রই অধিকার কি ? মানুষে মানুষে অধিকারের প্রভেদ নাই ? মানুষের নিজের তৈরী প্রভেদের কথা বল্‌ছি না, যে প্রভেদ ভগবান নিজে সৃষ্টি করে দিয়েছেন—মানুষের যা বাতিল করে দেওয়ার কোন উপায় নেই এবং যে প্রভেদমূলে নানাশ্রেণীর মানুষের ভিতর নানাশ্রেণীর অভাব-অভিযোগের সৃষ্টি হয়ে গেচে,—সে-ক্ষেত্রে কি হবে ? নারী-পুরুষের অধিকার সর্ব্বত্রই এক কি ?

গায়ে পড়ে হিত করবার আবশ্যক নেই

পুনঃ তিনি কহিতেছেন—

"আমি বাজে ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে কিছুতেই তাদের হিত করতে চাই নে। আমি বলিনে, বাছা তুমি স্ত্রীলোক, তোমার এ করতে নেই, ও করতে নেই, ওখানে যেতে নেই,—তুমি তোমার ভাল বোঝনা—এস আমি তোমার হিতের জন্য তোমার মুখে পরদা এবং পায়ে দড়ি বেঁধে রাখি। ডোমকেও ডেকে বলিনে, বাপু, তুমি যখন ডোম, তখন এর বেশী চলাফেরা তোমার মঙ্গলকর নয়, অতএব এই ডিঙ্গোলেই তোমার পা ভেঙ্গে দেব। দীর্ঘদিন বর্ম্মাদেশে থেকে এটা আমার বেশ করে শেখা যে, মানুষের অধিকার নিয়ে গায়ে পড়ে মিলে তার হিত করবার আবশ্যক নেই। আমি বলি, যার যা দাবী সে ষোল আনা নিক্। আর ভুল করা যদি মানুষের কাজেরই একটা অংশ হয় ত, সে ভুল করে ত বিস্ময়েরই বা কি আছে। দুটো পরামর্শ দিতে পারি—কিন্তু মেরে-ধরে হাত-পা খোঁড়া করে ভাল তার করতেই হবে, এত বড় দায়িত্ব আমার নেই। অতখানি অধ্যবসায়ও নিজের মধ্যে খুঁজে পাইনে। বরঞ্চ মনে হয়, বাস্তবিক আমার মত কুড়ে লোকের মত মানুষে মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষাটা যদি জগতে একটু কম করে কোরত ত তারাও আরামে থাকত, এদেরও সত্যকার কল্যাণ হয়ত একটু-আধটু হবারও জায়গা পেত। দেশের কাজ, দেশের মঙ্গল করতে গিয়ে, এই কথাটা আমার, তোমরা ভুলোনা।"

(ব্যক্তিগত কথা হচ্চে না—সবাই আর কিছু কুড়ে হয় না। যারা কুড়ে নয় তারাও কি কাকেও সদুপদেশ দেবে না? হাত-পা খোঁড়া করে, মেরে-ধরে পরের উপকার ক'টা লোকেই বা আর করতে যায়।

গুরু, শিক্ষক, নেতা, প্রচারক—এঁদের কি কোনও আবশ্যকতাই নেই—যে যা ভাল বুঝবে তাই করবে? যার যার নিজের পাণ্ডিত্যের উপরই ষোলআনা নির্ভর? আল্‌গা থেকে নিছক্ দুটো পরামর্শ দিয়েই সরে যেতে হবে! যীশুখৃষ্ট এই আদর্শ শেখাতেই কি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন? বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ—সব ভুল? মানুষ ভুল না করে পারে না বলেই—করুক সে যত খুসী ভুল? পরের ভাল করবার অধ্যবসায় কারু না থাকে না থাক্, কিন্তু কারু কারু যদি থাকেই, তবে সে কি মন্দ? আর তা থেকে তাকে বারণ কর্ত্তেও হবে? বুদ্ধদেব স্ত্রীলোকদিগকে প্রথমে তাঁর সঙ্গে স্থান দিতে চান নি, চৈতন্যদেবও তাই করেছিলেন—তাঁরাও কি গায় পড়ে মানুষের অধিকারে বাধা জন্মাতে গিয়ে ভুল পথে চলেছিলেন?")

প্রাচীনের ওপর নবীনের আক্রমণের কথা কহিতে গিয়া আজ আমরা এইখানে মাত্র এই দুইটী শক্তিশালী লেখকের কথারই উল্লেখ করিলাম; একজন বিগত যুগের প্রতীক, অপর নূতন যুগের মুখপাত্র।

কিন্তু বিরুদ্ধবাদীর দলে আরও অনেক আছেন; অনেক শক্তিমান, জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান লোকেরও এদলে অভাব নাই। বিশেষ করিয়া নব্য বাঙ্গলায়ই ইহাঁদের বড় প্রাদুর্ভাব। পাশ্চাত্যজগতে ইদানীং যে ঝুড়ি ঝুড়ি যৌনবিষয়ক পুস্তক বাহির হইতেছে, উহাদের ফ[illegible]ই এই দলটী ক্রমে ভারী হইয়া উঠিতেছে, এমন মনে হয়। [illegible] বিষয়ক গ্রন্থের কোথায়ও যে কোন উপকারিতা নাই—এমন কথা বলিতেছি না, স্ত্রী-পুরুষের বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধটা জানা থাকে ত ভালই; কিন্তু দেখা যায়, কি লেখক, কি পাঠক—অনেক সময় মাত্রা অতিক্রম করিয়া যান, তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া তদনন্তর 'খোদার ওপর খোদকারী' করিতেও অনেকে কসুর

করেন না—ঐখানেই যত গোলযোগ। নারীপুরুষকে সর্ব্বথা এক করিবার অভিপ্রায়ে নারীর সকলপ্রকার প্রাকৃতিক বৈষম্যকে উপেক্ষা করিয়া নানা কৃত্রিম উপায়ে জোর করিয়া তাহারা তাহাকে ভিতরে বাহিরে পুরুষের মত করিবার ফাঁক-ফন্দি খোঁজেন। তাই, সেদিন কোন একখানা ইংরাজী কাগজে পড়িতেছিলাম—

"Freud has explained that the anatomical difference between the sexes plays the leading role in the development of the "Masculine Complex" in a woman, leading her to behave as though she were a man in many directions * * * her organ inferiority is felt by a woman as a narcistic wound which she tries to compensate by imitation of masculine habit."

অর্থাৎ, "ফ্রুড নামা কোনও পণ্ডিত বলেন, নারী-পুরুষের দেহগত পার্থক্যবশতঃই নারীর মধ্যে পুরুষাত্মকভাবের একটা আকাঙ্ক্ষা বিশেষ করিয়া জাগিয়া উঠে। ইহার জন্যই নারী বহুক্ষেত্রে পুরুষের অনুকরণ করিয়া চলিতে চায়—এই দেহগত হীনাবস্থাটাকে একটা বিষাক্ত ক্ষতস্বরূপ মনে করিয়া সর্ব্বপ্রকার পুরুষসুলভ চলাফেরা ও ব্যবহার দ্বারা উহার প্রতিকারে যত্নবতী হয়।"

কিন্তু 'খোদার ওপর খোদকারী' সকল সময়েই সম্ভবপর হয় কি? আর হইলেও সব সময়েই কি উহাতে ভাল হয়? সভ্য হইতে যাইয়া প্রতিনিয়ত প্রকৃতির ওপরে নানাভাবে আমরা হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হই সত্য, কিন্তু সম্ভব-অসম্ভব এজ্ঞানটাও সর্ব্বত্রই রাখিতে হয়, এবং শেষ পর্য্যন্ত কোথায় কিসে কিরূপ ফল দাঁড়ায়—সে বিচারটাও থাকা আবশ্যক। সৃষ্টির মূলনীতি সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বদা রক্ষা করিবেনই—শত চেষ্টায়ও মানুষ তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারে না, কখনও পারে নাই,

কখনও পারিবেও না। তাই উক্ত লেখকই পুনঃ নিবেদন করিতেছেন দেখিতেছি—

"Even Freud with his wonderful insight and genius has not yet been able to fully analyse some aspects of women's psycho-sexual development. The finest oscillations in human souls giving birth to ideas that will survive unto eternity, have in many cases had origin in the superb personality of women. Artistic idealization reached its zenith in the worship of the Madonna." (Advance, Dec, 8, 1931).

সরল কথায় এইকথাগুলির মানে এই যে,—ফ্রয়েডের মত দার্শনিক ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিও এপর্য্যন্ত নারীচরিত্রের যৌবনভাববিকাশক কয়েকটা রহস্যের বিশ্লেষণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, মনুষ্যচিত্তের যে-সব অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব বিক্ষেপের ফলে অনন্তকালব্যাপী ভাবধারার সৃষ্টি হয়, অনেক ক্ষেত্রেই উহারা নারীর বিচিত্র ব্যক্তিত্ব হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে। মাতৃমূর্ত্তির পূজাতেই আদর্শ-সৌন্দর্য্যসৃষ্টির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ।

যাহাহউক, এই সত্যটা অনেকসময়েই আমাদের লক্ষ্যপথ হইতে সরিয়া পড়ে বলিয়াই যত বিপদ। অনেক শক্তিমান শিক্ষিত সংস্কারক ও নেতারও তাই এইভাব দেখি যে, নারী-পুরুষের অধিকার বস্তুতই এক; শুধু মানুষের ভুলকার্য্যবশতঃই যত গোলযোগ ঘটিতেছে, কিন্তু আবার এই মানুষের চেষ্টা-উদ্যোগেই ঐসকল ভুলের সংশোধনও হইতে পারে। কিন্তু এইজাতীয় বিরুদ্ধবাদীর সংখ্যা যাহাই হউক, উহাঁদের বিবাদের ও তর্কের মূল যে ঐ এক—নারীর অধিকার ও

স্বাধীনতা পুরুষের মত সর্ব্বত্রই মুক্ত কি না, নারী-পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র সর্ব্বত্রই এক কি স্বতন্ত্র—সে-বিষয়েও সংশয় নাই। আমরা পূর্ব্বোক্ত ঐ দুইটী শক্তিশালী লেখকের কথার জবাবেই এই মূল-আপত্তিটী সম্বন্ধে আমাদের যাহা কিছু বক্তব্য সকল ব্যক্ত করিয়াছি, সুতরাং অপর আর কাহারও কথায় অনাবশ্যক। তথাপি, এমন যদি কেহ মনে করেন যে, যথায় এত লোক এই কথা কহিতেছে তথায় আমাদের একার কথায় অপ্রত্যয়—সেই আশঙ্কায় কহিতেছি,—বস্তুতঃ ইহা আমাদের একার কথাও নহে। অনেক বিশিষ্ট বিশিষ্ট পাশ্চত্য মনস্বিগণের মতবাদও আজকাল আমাদের কথায়ই সায় দিতেছে—এবং সর্ব্বত্রই জ্ঞানিবর্গের মধ্যেও আবার একটা নূতন ভাবধারার সৃষ্টি হইয়া আমাদের মতবাদই আজকাল অনেকাংশে সমর্থিত করিতেছে। একথা যে অমূলক নয়—প্রয়োজন হইলে এই গ্রন্থেরই দ্বিতীয় একভাগে বারান্তরে সে-কথার পুনঃ আলোচনা করিব—কিন্তু আজ আর নয়।